তেপান্তরী

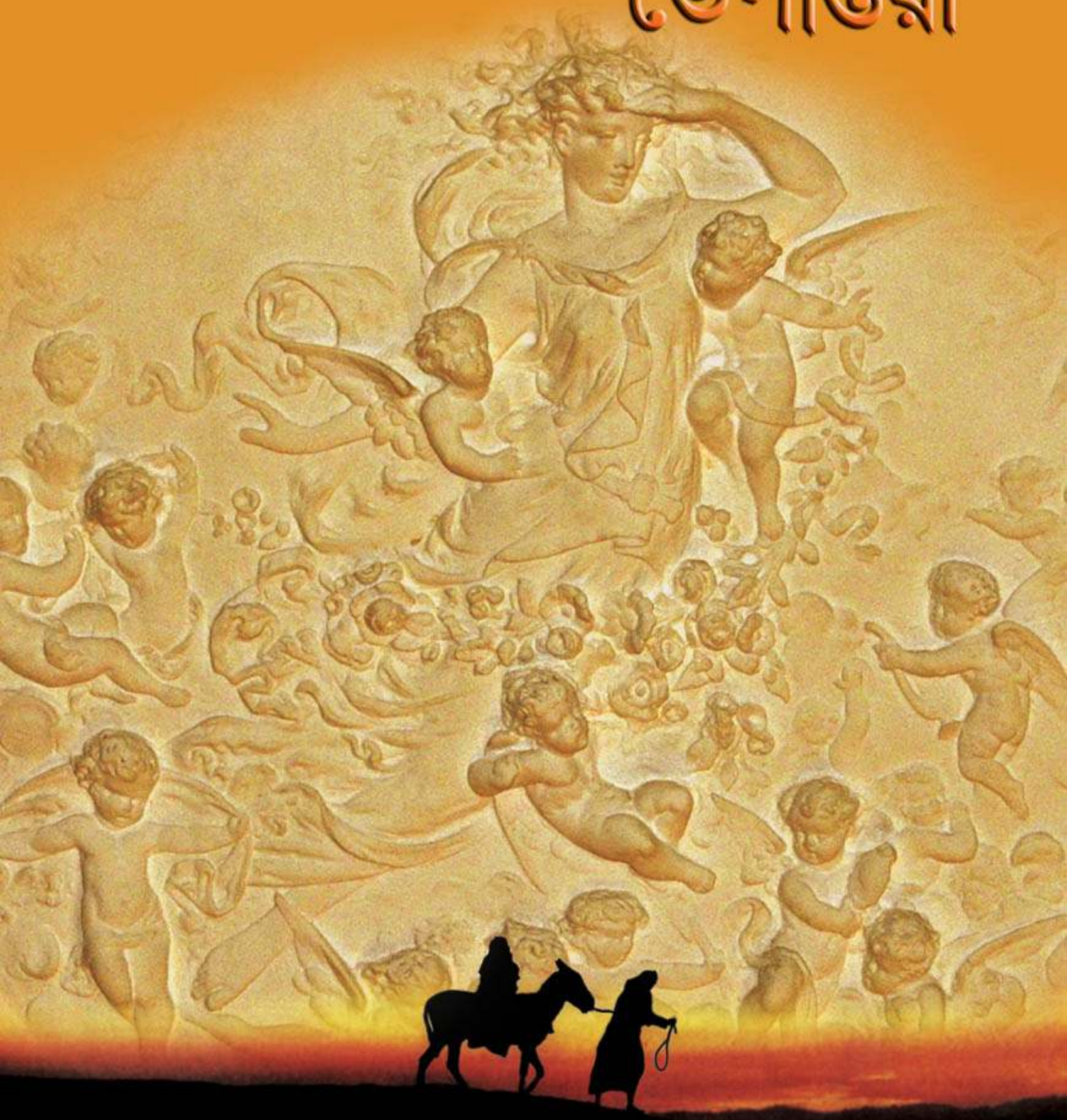

Probashi Bengali Christian Association

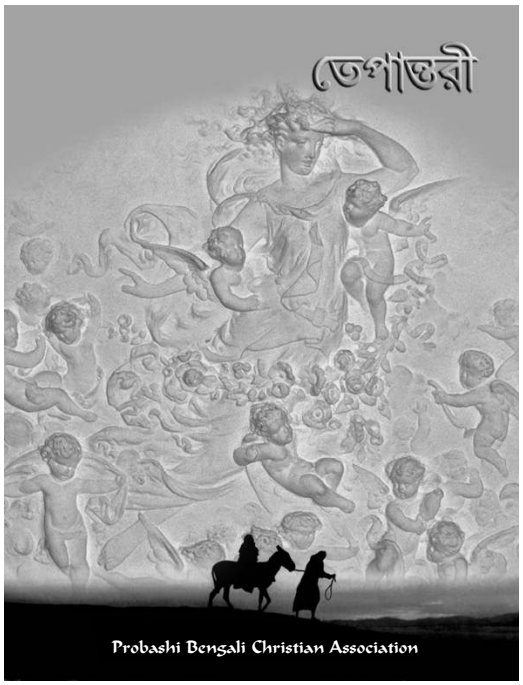

তেপান্তরী ২০০৬ Tepantori 2006

ঊনবিংশ সংকলন 19th Issue

বড়দিন সংখ্যা Christmas Edition

সম্পাদক মন্ডলীঃ

সাইমন গমেজ
যোসেফ ডি' কস্তা
সুবীর এল রোজারিও

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

শিলা রোজারিও
ডোমিঙ্গো অনিল গমেজ
অনিল রোজারিও
ডেরিক গনছালবেস
ইউফ্রেজি পূর্ণিমা গমেজ
নরবার্ট মেন্ডেজ
বার্নাডেট তিলু গমেজ
ম্যাবেল কুইয়া

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়ঃ

সাইমন গমেজ

কম্পোজ, গ্রাফিক্স ও প্রিন্টঃ

Rashed- (917) 607-6833
E-mail: raansoft@yahoo.com

ভেতরের পাতায় . . .

২ ..... খ্রীষ্টান সংগঠনসমূহের তালিকা ও সম্পাদকীয়
৩ ..... সভাপতির শুভেচ্ছা
৪ ..... সাধারণ সম্পাদকের শুভেচ্ছা
৫ ..... ফাদার ষ্ট্যানলী গমেজের শুভেচ্ছা
৬ ..... Tribute to Dr. Yunus
১৩ ..... God's Provision
২১ ..... Few Things about Christmas
২৭ ..... Christian Life
৩৩ ..... প্রেক্ষাপটঃ আর্চবিশপ টি.এ. গাঙ্গুলী
৪১ ..... একটি সুহৃদ প্রামান্যচিত্র
৪৭ ..... Remembering the Servant of God
৫১ ..... দু'টি গল্প
৫৫ ..... আমি ক্ষমা চাই
৬১ ..... আঠারগ্রাম অঞ্চল
৬৫ ..... প্রবাসী'র দিনগুলি (রঙিন)
৮৭ ..... বড়দিন - উপহার
৮৯ ..... When I Close My Eyes
৯৩ ..... My First Camp Experience
৯৩ ..... বাংলা মিনিষ্ট্রি ওয়ার্ল্ডওয়াইড
৯৭ ..... ভ্রমন - উত্তর আমেরিকার প্রবাসী বাঙ্গালী
৯৯ ..... Statue of Liberty
১০০ ..... বাণী চিরন্তনী - লক্ষণীয় বিষয়
১০৩ ..... In Memory Of Rebecca
১০৭ ..... আংশিক হলেও সত্য
১১১ ..... মনের সাথে যুদ্ধ
১১৩ ..... আষাঢ়ী কন্যার অগ্নিস্নান
১১৬ ..... Out Of Africa
১২৭ ..... যাদেরকে পেলাম
১২৮ ..... প্রথম কমিউনিয়ন / শুভ বিবাহ
১২৯ ..... ৫০তম বিবাহ বার্ষিকী উদযাপন
১৩০ ..... যাদেরকে হারালাম
১৩১ ..... কবিতাগুচ্ছ

প্রকাশনায় (**Published by**)ঃ

প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন / Probashi Bengali Christian Association

P.O. Box 1258, New York, NY 10159-1258
Phone: (917) 767-4632 (718) 441-4883
Website: www.pbcausa.org E-mail: info@pbcausa.org

CHRISTIAN ORGANIZATIONS IN NORTH AMERICA:

UNITED STATES OF AMERICA:

PROBASHI BENGALI CHRISTIAN ASSOCIATION. INC.
P.O. Box - 1258 Madison Square Station,
New York, NY 10159-1258 USA
Website : www.pbcausa.org Email: info@pbcausa.org
President : Mr. Joseph D'Costa 917-767-4632
General Secretary : Mr. Richard Biswas 718-441-4883
Registered non-profit 501 (C) (3) organization.

SOURCE AND SOLUTION INC. (COOPERATIVE SOCIETY)
P.O. Box -770691 Woodside Station, NY 10377-770691 USA
President: Mr. Derrick Penherio 646-271-6192
General Secretary : Mr. John Rodrigues 718-429-3273

BANGLADESH CHRISTIAN ASSOCIATION
10-08 Balsamwood Drive, Laurel, MD 20903 USA
Website: www.BCA-DC.org
President : Mr. Sampad Pareira 240-295-0851
General Secretary : Mr. Albert Gomez 240-620-3357

BANGLADESH AMERICAN CHRISTIAN ASSOCIATION
1415 Dilston Road, Silver Spring, MD 20903
Tel: 301-439-4378 Fax: 301-890-5139
E-mail: felixmgomez@hotmail.com
President: Khokon Stanley Gomes 301-439-4378
General Secretary: Felix Marcian Gomez 301-890-5139

BANGLADESH CHRISTIAN CO-OPERATIVE SOCIETY
516 Pauls Drive, Silver Spring, MD 20903
President : Mr. Jerome Pobitra Rozario 301-439-1370
General Secretary : Mr. Henry Rozario 301-345-2618
E-mail : pobitra@aol.com

CANADA :

BANGLADESH CATHOLIC ASSO. OF ONTARIO, CANADA
50 Roebuck Drive, Scarborough, ON M1K 2HS CANADA
President : Mr. John D' Rozario 416-654-1634
General Secretary : Mrs. Agnes Gomes 416-784-5643

BANGLADESH CHRISTIAN COOPERATIVE OF ONTARIO,INC.
55 Lioden Avenue, Toronto, ON M1K 311 CANADA
E-mail : bccso2000@hotmail.com
President : Dr. David Mazumdar 416-267-5221
General Secretary : Mr. Gabriel Sandip Rozario 416-269-2142

THE BANGLADESH CATHOLIC ASSOCIATION OF CANADA MONTREAL
7045 Champagneur Avenue # 8, Montreal, QC H4E 3J2 CANADA
President: Mr. Sunil Gomes 514-748-2762
General Secretary: John Anthony Gomes 514-495-2792

UNITED BENGALI CHRISTIAN SOCIETY, CANADA
2114, Thierry, Lasalle, Quebec, H8N 1H7, Montreal, Canada
President: Mr. Edward C. Gomes

BERMUDA

BENGALI CULTURAL ORGANIZATION, BERMUDA
35 Happy Vally Road
Pambrook HM 12 Hamilton BERMUDA
President: Mr. Robin Deesa 441-296-8336
General Secretary: Mr. Shajol Gomes 441-232-5931

সম্পাদকীয়

আরেকটি বছর পেরিয়ে আমরা আবার এসে দাড়িয়েছি বড়দিন ও নববর্ষ উদযাপনের শুভক্ষনে। খ্রীষ্টের জন্মোৎসবের আনন্দধারা, আমাদের সবার হৃদয়ে সঞ্চার করে, এক নতুন অনুভূতির। সারা বছরের সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, মান-অভিমান সবকিছুকে দুরে সরিয়ে, আমাদের হৃদয় মন্দিরে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করে ঈশ্বরের ভালবাসাকে। এই ভালবাসার প্রেরনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, আমরা নতুন ভাবে আলিঙ্গন করি একে অপরকে। জীবনের এই সুন্দর মুহূর্তগুলোকে স্মরনীয় করে রাখার প্রয়াসে, আরো সুন্দরভাবে ভাবের প্রকাশের লক্ষ্যে সমসাময়িক চিন্তাধারা সমাজের সকলের সাথে উপভোগ করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা তেপান্তরীর বড়দিন সংখ্যাকে ঢেলে সাজিয়েছি।

আশা করি আমাদের এই প্রচেষ্টা সকলকে নির্মল আনন্দদানে সক্ষম হবে। সকলের জন্য রইল বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা।

– সম্পাদক মন্ডলী

সভাপতির শুভেচ্ছা

এক ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন গভীর রাত্রে, মরু প্রান্তরে রাত জেগে পশুপালে প্রহরারত একদল ডানপিটে রাখালদের মাথার উপর হঠাৎ আবির্ভূত হয় স্বর্গদূতেরা। ভীত-সন্ত্রস্ত রাখালদের অভয় দিয়ে দেবতারা বলে গেল - "আজ দাউদ নগরীতে তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছেন - তিনি খ্রীষ্ট, স্বয়ং প্রভূ"' (লুক ২:১১)। দেবদূতের কাছে এই অদ্ভূত ঘটনার কথা শুনে রাখালেরা ছুটে যায় বেথলেহেমে। সেখানে তারা দেখতে পায় কাপড়ে জড়ানো জাবপাত্রে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু যীশুকে। মনুষ্যবেশে এই মর্ত্যে প্রভূ যীশুর জন্মগ্রহণ সমগ্র বিশ্বে বড়দিন হিসেবে অভিহিত।

বর্ষ পরিক্রমায় প্রতি বছর বড়দিন আসে আর যায়। প্রতি বছর যতদিন বিশ্বের বুকে মহান সৃষ্টিকর্তার মিলন - শান্তি ও ন্যায্যতার বাণী নিয়ে উপস্থিত হয়। তবে আজ বিশ্বের কোথাও নিরবিচ্ছিন্ন মিলন - শান্তি ও ন্যায্যতা বিরাজিত নেই। বিশ্বের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় কোথাও কোথাও এই বাণী সুদূর পরাহত, অবহেলিত ও অপ্রত্যাশিত। স্রষ্টার মহানবাণী সেখানে লাঞ্ছিত, ধুলোয় লুণ্ঠিত, বিশ্বমানবতা ক্রন্দিত। কিন্তু খ্রীষ্ট ছিলেন ন্যায়-বিচারক। শান্তির অগ্রদূত। অসীম মানব প্রেমিক।

প্রবাসী সমাজ বাণীর প্রতি আজ আমার একান্ত কামনা - আসুন আমরা সবাই নিজ নিজ পরিবার ও সমাজে প্রথম খ্রীষ্টের আগমনের এই মর্মবাণী মিলন - শান্তি ও ন্যায্যতা স্থাপন করি। তাহলে বড়দিন উদ্‌যাপন হবে যথার্থ ও পরিপূর্ণ। তবেই খ্রীষ্ট আমাদের মাঝে সদা বিরাজিত থাকবেন। তার অনুগ্রহ, আশীর্বাদ ও কৃপা লাভে আমরা সর্বদাই সক্ষম হবো।
পরিশেষে, প্রবাসের সকলের প্রতি রইল বড়দিন ও নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম।

- ধন্যবাদ

যোসেফ ডি' কস্তা (বিকাশ)
সভাপতি
প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন

সাধারণ সম্পাদকের শুভেচ্ছা

একের পর এক ভাববাদী প্রেরণ করেও ঈশ্বর যখন দেখলেন সমগ্র মানব সমাজ পাপের কালিমা থেকে মুক্ত না হয়ে নিজেদেরকে আরও ব্যাপকভাবে আঁকড়িয়ে ধরেছে, তখনই ঈশ্বর যীশুখ্রীষ্টকে পাঠালেন যেন প্রত্যেকে নব জীবন পায়।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের স্মরণার্থে পৃথিবীব্যাপী খ্রীষ্টসমাজ ২৫শে ডিসেম্বর অত্যন্ত জাঁকজমক ও প্রবল উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে যে উৎসবে মেতে উঠে তাই "বড়দিন" নামে প্রচলিত হয়ে আসছে।

বড়দিন হলো ঈশ্বর যে আমাদের প্রেম করেন, বৈৎলেহমে শিশু যীশুর জন্মই তার প্রতীক। পরস্পর -এর প্রতি আমাদের এই প্রেমই যেন আজকের শপথ হয় আগামী দিনের জন্য।

বিগত বড়দিনের পূণর্মিলন, বনভোজন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সফল করার পিছনে যারা সাহায্য করেছেন - তাদেরকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আগামী দিনগুলি সুন্দর থেকে সুন্দরতম হবার প্রতিশ্রুতিই যেন আমাদের লক্ষ্য হয়। সকলকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ। শুভ বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছান্তে॥

- ধন্যবাদ

রিচার্ড বিশ্বাস
সাধারণ সম্পাদক
প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন

বড়দিনের শুভেচ্ছা

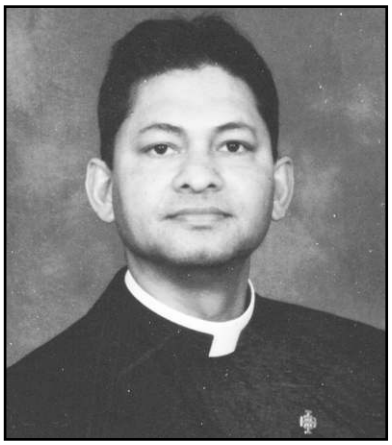

"হবে তাঁর আগমন
আমরা অনুক্ষণ রয়েছি প্রত্যাশায় মুক্তি প্রতিক্ষায়
হবে তাঁর আগমন।
লভিব মুক্তিপণ লভিব পরিত্রাণ তাঁরি মহা করুণায়।
হবে তাঁর আগমন।"

(গীতাবলী ৩৬৯, কথাঃ মতিলাল দাস, সুরঃ সুশীল বাড়ৈ)

প্রতিটি বাঙ্গালী খ্রীষ্টভক্তের কাছে উপরোক্ত শব্দগুলো অত্যন্ত শ্রুতিমধুর সুরধ্বণির মধ্য দিয়ে খুবই স্মরণীয়। বিশেষ করে ডিসেম্বর মাসে রোববারের খ্রীষ্টযাগের শুরুতে সুরেলা এই ধর্মীয় সঙ্গীত আমাদের সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে মানব জাতির ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু আবারো আমাদের মাঝে আসছেন। এই সময় আমরা সর্বান্ত করণে চেষ্টা করি যীশু খ্রীষ্টের আগমনের পথ প্রস্তুত করে তাঁর জন্ম জয়ন্তী পালন করতে। খ্রীষ্টের ধরায় আগমনের দিনটি শীত ঋতুর সময়ের বিচারে ছোট একটি দিন হতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক ও ঐশ্বরিক কারণে দিনটি বাঙ্গালী খ্রীষ্টভক্তদের কাছে "বড়দিন" হিসেবেই অভিহিত। সেজন্যে আমরা ঘটা করে বড় আকারেই এই দিনটি পালন করি। এই জন্মোৎসব সকল মানব জাতির জন্যে, সারা বিশ্বের জন্যে। যীশু খ্রীষ্টের জন্ম মানব জাতির ইতিহাসকে পরিপূর্ণ করেছে, সমগ্র মানবজাতিকে ঈশ্বরের কাছে টেনেছে এবং ঐশ্যরাজ্যের নাগরিক করেছে। এ'জন্যেই বড়দিনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। আগমন কালীণ প্রার্থনা, ত্যাগ, ধ্যান, তপস্যা ও দয়ার কাজের মধ্য দিয়ে সকল খ্রীষ্টভক্ত সুযোগ পায় খ্রীষ্ট প্রভুকে নিজেদের হৃদয় গোশালায় জন্ম দিতে ও তাঁর মধ্য দিয়ে মুক্তিপণ লাভ করতে এবং তাঁর মহা করুণায় সিক্ত হয়ে পরিত্রাণ লাভ করতে।

যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যাশিত আগমনের আনন্দ, তাঁর প্রদত্ত মুক্তি ও পরিত্রাণের বাণীকে লেখনীর মাধ্যমে 'প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন' তাদের মুখপত্র "তেপান্তরী"তে প্রকাশ করছে। এটা সত্যি আনন্দ ও গর্বের বিষয়। বড়দিনের আনন্দ-উৎসব সত্যিকার অর্থে দীর্ঘ হোক সকলের জীবনে এবং নববর্ষ বয়ে আনুক সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য, এই প্রার্থনা ও আমার যাজকীয় আশীর্বাদ (✝) সহ -

ফাঃ স্ট্যান্‌লী গমেজ (আদি)

Tribute To Nobel Peace Laureate Dr. Muhammad Yunus

It is with great pride that we the Probashi Christians of Bangladesh in the United States of America would like to extend our heartfelt congratulations to Dr. Muhammad Yunus and the Grameen Bank on receiving the Nobel Prize for Peace for 2006. It is indeed a great honor to Bangladesh that such a prestigious award has been given to a poor developing country like Bangladesh, which acknowledges that poverty can be eradicated with hard work, dedication and collective collaboration of the grass roots people.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2006, divided into two equal parts, to Muhammad Yunus and Grameen Bank for their efforts to create economic and social development from below. Lasting peace can not be achieved unless large population groups find ways in which to break out of poverty. Micro-credit is one such means. Development from below also serves to advance democracy and human rights.

Muhammad Yunus has shown himself to be a leader who has managed to translate visions into practical action for the benefit of millions of people, not only in Bangladesh, but also in many other countries. Loans to poor people without any financial security had appeared to be an impossible idea. From modest beginnings three decades ago, Yunus has, first and foremost through Grameen Bank, developed micro-credit into an ever more important instrument in the struggle against poverty. Grameen Bank has been a source of ideas and models for the many institutions in the field of micro-credit that have sprung up around the world.

Muhammad Yunus has had phenomenal success helping people lift themselves out of poverty in rural

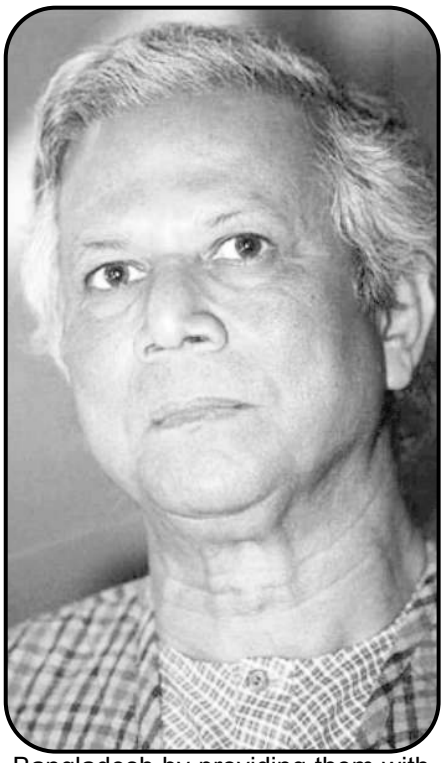

Bangladesh by providing them with credit without requiring collateral. Yunus developed his revolutionary micro-credit system with the belief that it would be a cost effective and scalable weapon to fight poverty.

Yunus told his story and that of the bank in the book "Banker to the Poor," co-authored by him and Alan Jolis. In the book, Yunus recalls that in 1974 he was teaching economics at a Chittagong University in southern Bangladesh, when the country experienced a terrible famine in which thousands starved to death.

"We tried to ignore it," he says. "But then skeleton-like people began showing up in the capital, Dhaka. Soon the trickle became a flood. Hungry people were everywhere. Often they sat so still that one could not be sure whether they were alive or dead. They all looked alike: men, women, children. Old people looked like children, and children looked like old people.

The thrill he had once experienced studying economics and teaching his students elegant economic theories that could supposedly cure societal problems soon left him entirely. As the famine worsened he began to dread his own lectures.

"Nothing in the economic theories I taught reflected the life around me. How could I go on telling my students make believe stories in the name of economics? I needed to run away from these theories and from my textbooks and discover the real-life economics of a poor person's existence."

Yunus went to the nearby village of Jobra where he learned the economic realities of the poor. Yunus wanted to help, and he cooked up several plans working with his students. He found that one of his many ideas was more successful than the rest: offering people tiny loans for self-employment. Grameen Bank was born and an economic revolution had begun.

Grameen Bank has reversed conventional banking wisdom by focusing on women borrowers, dispensing of the requirement of collateral and extending loans only to the very poorest borrowers. In fact, to qualify for a loan from the Grameen Bank, a villager must demonstrate that her family owns less than one half acre of land.

The bank has provided $4.7 billion dollars to 4.4 million families in rural Bangladesh. With 1,417 branches, Grameen provides services in 51,000 villages, covering three quarters of all the villages in Bangladesh. Yet its system is largely based on mutual trust and the enterprise and accountability of millions of women villagers.

Today, more than 250 institutions in nearly 100 countries operate micro-credit programs based on the

Grameen Bank model, while thousands of other micro-credit programs have emulated, adapted or been inspired by the Grameen Bank. According to one expert in innovative government, the program established by Yunus at the Grameen Bank "is the single most important development in the third world in the last 100 years, and I don't think any two people will disagree."

As founder of the Grameen Movement, Professor Muhammad Yunus is a revolutionary. His ideas couple capitalism with social responsibility and have changed the face of rural economic and social development forever.

Professor Yunus is responsible for many innovative programs benefiting the rural poor. In 1974, he pioneered the idea of Gram Sarker (village government) as a form of local government based on the participation of rural people. This concept proved successful and was adopted by the Bangladeshi government in 1980. In 1978, he received the President's award for Tebhaga Khamar (a system of cooperative three-share farming, which the Bangladeshi government adopted as the Packaged Input Program in 1977).

A Fulbright Scholar at Vanderbilt University, Professor Yunus received his Ph.D. in Economics in 1969. Later that year, he became an assistant professor of Economics at Middle Tennessee State University, before returning to Bangladesh where he joined the Economics Department at Chittagong University.

The UN secretary general appointed Professor Yunus to the International Advisory Group for the Fourth World Conference on Women in Beijing from 1993 to 1995. Professor Yunus has also served on the Global Commission of Women's Health (1993-1995), the Advisory Council for Sustainable Economic Development (1993-present), and the UN Expert Group on Women and Finance. He also serves as the chair of the Policy Advisory Group (PAG) of Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP). Yunus has also served on many committees and commissions dealing with education, population, health, disaster prevention, banking, and development programs. He is currently on the boards of many international organizations including Amanah Ikhtiar Malaysia (a Grameen replication project), the International Rice Research Institute in the Philippines, and Credit and Savings for the Poor in Malayasia. Professor Yunus also sits on the board of the Calvert World Values Fund, the Foundation for International Community Assistance, the National Council for Freedom From Hunger, RESULTS and the International Council of Ashoka Foundation, all of which are located in the US.

Professor Yunus has received the following International awards: the Ramon Magsaysay Award (1984) from Manila; the Aga Khan Award for Architecture (1989) from Geneva; the Mohamed Shabdeen Award for Science (1993) from Sri Lanka; and the World Food Prize by World Food Prize Foundation (1994) from the US. Within Bangladesh, he has received the President's Award (1978), Central Bank Award (1985), and the Independence Day Award (1987), the nation's highest award.

The biggest surprise for many people might be the nobel peace prize. Dr. Yunus is an eminent economist and his contribution is in the economic side, which was aimed at well being of the society. For me, Nobel peace price 2006 has a greater implication than the nobel prize on economics.

Bangladeshis see him not only as a nobel prize winner, but also a friend of poor. As his vision is peace comes from alleviating poverty, he has been able to spread his model of peace all over the world. So he is better off getting the peace prize, and it means a lot more to the world community than the nobel prize in economics.

By winning the Nobel prize, Dr. Yunus has also become the greatest of all Bangladeshis. Regardless of political parties, he can act as a spokesperson of bangladesh to the world community. We are in need of support and recognition from developed countries. And Dr. Yunus can lead this collosal task of raising support for Bangladesh worldwide.

Through Yunus's efforts and those of the bank he founded, poor people around the world, especially women, have been able to buy cows, a few chickens or the cell phone they desperately needed to get ahead.

The 65-year-old economist said he would use part of his share of the $1.4 million award money to create a company to make low-cost, high-nutrition food for the poor. The rest would go toward setting up an eye hospital for the poor in Bangladesh, he said.

Dr. Yunus in his acceptance speech has stressed that poverty in the world is an artificial creation and that if people really work towards alleviating poverty it will only be seen in "Poverty Museum" where people will see how poor people had once lived a cruel and inhumane life. He said that people can change their own lives provided that they have the right kind of institutional support. They are not asking for charity, charity is no solution to poverty. He said that his Grameen bank was not giving of charity, but lending money to the poor people who needed it most and to whom no bank would lend. There are now about five million borrowers in the Grameen bank.

Dr. Yunus and Grameen Bank have shown that even the poorest of the poor can work to bring about their own development. We salute Dr. Yunus's efforts to help the poor and in doing so achieving international acclaim and the Nobel Peace prize and bringing honor and pride to Bangladesh.

GOD'S PROVISION FOR MANKIND'S SALVATION

Thomas M. Sarker, ***Staten Island, NY***

The celebration of Christmas is all about embracing God's divine provision for salvation of our souls through Jesus Christ and rejoicing and praising God for His grace for us. He has given His Only begotten Son, Jesus Christ out of His unconditional, fathomless love. The celebration had begun in the heaven at the birth of Jesus and heavenly hosts were praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace, good will towards men"(Luke 2:14). The angel brought the good news, the salvation message to this world, and said, "I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is called Christ the Lord" (Luke 2:11). God the Father gave His Son, Jesus Christ to this world to save his people from their sins. Jesus was in the bosom of the Father and he declared his Father's will and said, "For God so loved the world, that he gave His only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish; but have everlasting life. For God sent not his son to condemn the world; but that the world through him might be saved" (John 3; 16, 17). He was full of grace and truth indeed and he is the only divine provision of God for mankind's salvation.

In the very beginning of his ministry Jesus declared the mission of his coming to this world and said, "The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised"(Luke 4:18). He had done everything in deed, what he said. The wonders and miracles, which Jesus performed from the Manger of Bethlehem to the cross of Calvary, were nothing but the fulfillment of his Father's will and demonstration of His unconditional infinite love. He established the only way of salvation of mankind through his crucifixion, death and resurrection. He reconciled the fallen humanity with God through his unconditional forgiveness. Jesus is the only provision of God for mankind's salvation as he said, "I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me. I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live: And whosoever liveth and believeth in me shall never die" (John 14: 6 & 11: 25-26).

The provision of God is the unconditional love and forgiveness through Jesus Christ, which can't be silenced. He laid down his life voluntarily on the cross of Calvary for the forgiveness of sins paying the ransom for all. He was blamed, mocked, scourged, persecuted and crucified, but in return he asked forgiveness for his persecutors and earnestly prayed, "Father, forgive them, for they know not what they do" (Luke 23; 34). It is the beauty of the unconditional love of God and the gift of forgiveness of God for the reconciliation of fallen humanity with Himself through His Son. Forgiveness is the only way for reconciliation and unconditional acceptance, which Jesus established on the cross of Calvary by his sacrificial death. He forgave his enemies unconditionally and commended to his disciple to do so and said, "This is my commandment, that ye love one another, as I have loved you. Love your enemies, bless them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you" (John 15: 12 & Math. 5: 44). He taught his disciples about forgiveness on teaching how to pray, "(Father!) Forgive us our debts, as we forgive our debtors" (Math. 6: 12).

The provision of God is extreme favor and unconditional acceptance in God's kingdom through Jesus Christ. Jesus is the only mediator between men and God for acceptance in God's kingdom. As Jesus said, "No man can come to me, except the Father which hath sent me draw him. I am the way the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me" (John 6; 44 and 14; 6). When God establishes His love and truth in anybody's heart, no one can take it away from him. Neither sin nor any other force can rob what He has established. It is the grace and acceptance of God through His Son. We can't deserve it but he has given it graciously. No matter who we are, how great our sin is, how deep dark our spiritual sights is, and how strong our bondage is, God accepted us unconditionally through His Son, Jesus Christ and made us free. Acceptance of this truth in faith is the eternal life, the assurance of freedom from strong bondage of sin and the greatest sense of peace. As he said, "Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me hath everlasting life" (John 6; 47). It is a new birth in Christ, extreme favor of God and new beginning of life. As apostle Paul said, "Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away: behold, all are become new" (2 Corinthian 5; 17).

The provision of God is the saving grace of God and transformation of life through Jesus Christ. We may have satisfaction with our money, wealth, possessions, prominence, prestige, popularity and our own righteousness, but still there is an emptiness deep down inside as long as we are in corruptible flesh; because the gains of this world can't give us any genuine peace, and security of our lives. Saul of Tarsus had all of it, but he was the most miserable and hopeless blind in the

way of Damascus by encountered with resurrected Christ. He could not save himself apart from the saving grace of Jesus Christ. Soft and gentle voice of Christ, "Saul, Saul, why persecutest thou me?" changed Saul's life. He had counted all his gains as lost and said, "I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ" (Philippians 3;8). We all need the Savior and his saving grace; this is why God sent His Son to save us. Saul, the greatest persecutor and hater of Christ became one of the greatest lovers of Christ by the saving grace of God and he became new man Paul in Jesus Christ. As he could say, "For I am persuaded, that neither death, nor life, nor an angel, nor principalities, nor power, nor things present, nor things to come. Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord' (Roman 8: 39).

The provision of God is the security of eternal living through Jesus Christ. As Jesus said, "All that the Father giveth me shall come to me; and him that cometh to me I will in no wise cast out" (John 6; 37). This acceptance of God is the eternal security of life through Jesus Christ. As Jesus said, " My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me: And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one" (John 10; 27-30

The provision of God is the eternal peace in Jesus Christ. Peace with God is the surety of heaven, because He is the owner of heaven. The man broke the covenant of peace, but God of love had re-established the covenant of peace by sharing Himself through His Son, Jesus Christ. Acceptance of the truth and our willful commitment to the hand of the Lord will give us joy, peace and eternal security of life in a moment and we will be certain about it. As Jesus called us, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me; I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your soul" (Mathew 11: 28-29). He promised, "Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid"(John 14:27). He gave us assurance of eternal living and said, "I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am there ye may be also" (John 14:2-3). His promises are true and he is faithful in his words and in deeds. As Jesus said, "Heaven and earth shall pas away: but my words shall not pass away" (Mark 13: 31).

May God richly bless you with His love, peace and joy and renew your spirit during this Christmas season and always, through His only begotten Son, Jesus Christ. Halleluiah, Amen.

With love in Christ.

Few Facts About Christmas

Collected by: Hema Rozario, *Flushing, NY*

MERRY CHRISTMAS!!!

The word "Christmas" means "Mass of Christ," later shortened to "Christ-Mass. " The even shorter form "Xmas" - first used in Europe in the 1500s - is derived from the Greek alphabet, in which X is the first letter of Christ's name: Xristos, therefore " X-Mass."

About the X

Europeans in the 16th century started using X in place of Christ's name as shorthand for writing Christ. The Christian monks and scholars were knowledgeable of the Greek letter X, - Chi or Khi - which is the first letter in the Greek word "Christos" or "Kristos" (Greek: CristoV) The Greek and Hebrew word "Christos" comes out "Messiah" and mean the same thing: "The anointed One." For many years the X was understood by Christian clergy and as time passed, many Christians, educated and not, were not aware of the meaning. Over time the meaning became lost and was later of perceived as a sign disrespect.

ON CHRISTMAS CELEBRATIONS

Over the centuries, Christmas traditions have radically changed. The Christmas celebration itself once lasted for days without much advance planning; now the reverse is true : We spend an entire month preparing for one day. Many folk and religious traditions - such as dancing, music-making, and game-playing - have been replaced by what seems to be America's biggest Christmas tradition : shopping. We measure Advent in terms of "shopping days," and we culminate these frantic weeks with a gift-opening ritual that is often almost as frantic. And then Christmas comes to an abrupt end.

Christmas should be a family time, but oddly enough, surveys show that we spend less time with our immediate families during the month of December than at any other time. What is more, reserchers tell us there is a 15 percent increase in the number of people seeking help for depression at this time of year. We work so hard to make our Christmases magic and meaningful; no wonder we get depressed when we're left with hearts that are empty and lonely.

In reality, shared experiences, not objects or gifts, are the things that remain in our hearts the longest. As families, we need to determine what we truly long for at Christmas - and then we must choose to celebrate the traditions that will help us to capture the essence of those longings.

A word of warning, though:

Sometimes our traditions, if held too tightly, can rob us of our Christmas joy. Be sure your traditions point you to Jesus - HE IS THE REASON FOR THE SEASON.

Twelve days of Christmas

People often think of The Twelve Days of Christmas as the days preceding the festival.

Actually, Christmas is a season of the Christian Year that last for days beginning December 25 and lasting until January 6, the Day of Epiphany - when the church celebrates the revelation of Christ as the light of the world and recalls the journey of the Magi.

From 1558 until 1829 people in England were not allowed to practice their faith openly. During this era someone wrote 'The Twelve Days of Christmas' as a kind of secret catechism that could be sung in public without risk of persecution. The song has two levels of interpretation: the surface meaning plus a hidden meaning known only to members of the church.

Each element in the carol is a code word for a religious reality.

1. The partridge in a pear tree is Jesus Christ.

2. The two turtledoves are the Old and New Testaments.

3. Three French hens stand for faith, hope and love.

4. The four calling birds are the four Gospels.

5. The five gold rings recall the torah (Law) the first five books of the Old Testament.

6. The six geese a-laying stand for the six days of creation.

7. Seven swans a-swimming represent the sevenfold gifts of the Spirit.

8. The eight maids a-milking are the eight beatitudes.

9. Nine ladies dancing are the nine fruits of the spirit (Gal.5).

10. The ten lords a-leaping are the Ten Commandments.

11. Eleven pipers piping stand for the eleven faithful disciples.

12. Twelve drummers drumming symbolize the 12 points of belief in the Apostles Creed.

There you have it, the HIDDEN meaning of "The Twelve Days of Christmas" and the secret behind the song.

Received this from a friend and it gave new meaning to the song we sing at this time of year.

May your Christmas be a happy, blessed one!

Christmas is a journey of the heart, bringing peace and happiness to all.

CHRISTIAN LIFE - IN FEW SIMPLE WORDS

Gerald Gomes, *Iselin, NJ*

"Love your neighbor." Mathew 5:43

Who is our neighbor? Everyone - One who lives next to us, one who works with us, one who plays with us, one who travels with us, one we see or not see everyday, even the one who hates us. We shall wish good for our neighbor, do good to our neighbor whether the neighbor is Christian, Jewish, Muslim, Hindu, Buddhists or anyone else.

"Love your enemies and pray for those who persecute you." Mathew 5:44

"If someone strikes you on the right cheek, turn to him the other also." Mathew 4:31

Be compassionate. It is probably the hardest teaching in the Bible to follow. But at least we should know about it, think about it, accept it and apply it. More problems in this world can be solved, more conflicts can be resolved, more hatred can be overcome and more love can be spread through compassion than retaliation.

We need to be compassionate when dealing with conflicts within our family members - with husband or wife, with our children, with our parents and siblings, with our friends and acquaintance or even non-acquaintance. This very core of Christian teaching can nourish the love within our family and family next to us; and before we know it, this will bring forth a better world for all of mankind.

Kingdom of God does not mean to acquire and rule over earthly possessions. It is in our heart.

Faith is a matter of our heart. When we accept grace, our heart leaps in joy before we know it. It is not how many people call ourselves Christians, it is not how much wealth and possessions we have here on earth or it's not how many countries we spread over that will make God's kingdom bigger, it is how many souls accepted grace of God through the word of Jesus by following his teaching, makes the God's kingdom bigger.
In fact grace works very mysteriously, and the kingdom of God becomes bigger even when one may not call himself or herself as a Christian but yet accepts His teaching in heart. On the other hand, someone calling himself or herself a Christian and not following His path diverts away from His kingdom.

"store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy" Mathew 6:20 "whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. "Mathew 18:4

"but the worries of this life, the deceitfulness of wealth and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. Others, like seed sown on good soil, hear the word, accept it, and produce a crop" Mark 4:19-20

What we will do for the needy, we will do that for Him.

When we help the poor, shelter the homeless, nurse the diseased; we do that to God Himself. That is the way to server God. Charity begins at home. We can start by attending our family members when in need - when one need a smile, when one needs a hand, when one needs to be cared. We can open our hearts to the people of this world who are in need. We can always help others by remembering them in our prayer.

"Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet." John 13:14

"For I was hungry and you gave me something to eat, I was thirsty and you gave me something to drink, I was a stranger and you invited me in, I needed clothes and you clothed me, I was sick and you looked after me, I was in prison and you came to visit me." Mathew 25:35-36

Rejoice when a lost soul sees the light again and repent.

Through our weakness, we shall make mistake and commit sin by harming others and by not following goodness of heart what Jesus taught us. But when we realize our mistake, repent and come out of sin and do not repeat the sin, God will forgive our sin.
"There will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous persons who do not need to repent." Luke 15:7

"My son,' the father said, 'you are always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad, because this brother of yours was dead and is alive again; he was lost and is found." Luke 15:31-32

"No one can come to me unless the Father who sent me
draws him" John 6:44

God created every human out of love. And everyone is His child. He continuously calls all his children to Him.

The very fact that we took an interest to read His words says He has lead us to Him. When His loving words are accepted in our hearts, our hearts will leap in joy and we will feel it right way.

"Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you." Mathew 7:7

"I am the way and the truth and the life. One who comes through me will find eternal life."
John 14:6

Anyone who follows His teaching will find the light of truth and will find eternal life regardless they call themselves as Christian, Muslim, Jewish, Hindu, Buddhists or any other.

So, will only Christians find eternal life and go to heaven?
No. Anyone who finds the grace of God will find eternal life and go to heaven. Jesus became man to show us the path through his life and death. By merely being Christian does not mean we will find eternal life. By accepting the teaching of love and compassion and by overcoming hatred we will be in the light, find the path of truth and that is the only way we can get eternal life. When we truly accept his teaching and follow the path He showed us, that is the only time it makes us a true Christian.
"Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my

Father who is in heaven." Mathew 7:21

"Forgive our trespasses and teach us to forgive who trespass against us." Mathew 6:12

Forgiveness is a big virtue. We need to forgive anyone who did any mischief against us and we also need to ask for forgiveness for any mischief we did against anyone.
In our daily life, through forgiveness and reconciliation we can overcome any disagreement and conflict between husband and wife, between parents and children, between friends or co-workers. Applying his teaching in our family is the first step to follow his teaching, as family is the core and basis of the entire humankind.

"Forgive and you will be forgiven." Luke 6:37

"'How many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to seven times?' Jesus answered, 'I tell you, not seven times, but seventy-seven times'". Mathew 18:21-22

Pray for God's mercy and grace -
"Lead us not into temptation and deliver us from evil." Mathew
6:13

Pray to God from your heart. It really does not matter where or when or how often we pray. It has no effect even if we recite the prayer millions of times while in the church unless we feel what we are saying.

We can pray to God directly the same way we have a conversation with one another.

Silently in our mind, we can pray while we are traveling, walking, studying or working anytime and anywhere. And while we pray, we need to understand what we are saying and we need say that from our heart. Even if we pray only once silently through our full conscious, we will receive peace that will fill our hearts with joy.

We shall pray for God to give us joy and peace in our mind everyday. We shall pray so that we can overcome temptation and greed arid we can reject all evil such as anger, dishonesty, injustice etc.

"What God has united, let no man separate." Mathew 19:6

When we come together through union of marriage, we need to value this as gift from God and make every effort to nurture to unite and grow as family in order to carry the light we received as Christians.

No one should destroy or harm this union.
"Let him be the one whoever is not a sinner to cast the first stone." John 8:7

We should not judge who is a sinner or and who is not. Let God be the one who will judge us all. God loves all His children including the sinner and continuously calls him or her to repent and come back to Him.

"Do not judge, or you too will be judged" Mathew 7:1

"First take the plank out of your own eye" Mathew 7:5

"Worship the Lord your God and serve Him only." Luke 4:8

There is only one God, who out of His love created us all and everything around us, everything that we know of and anything that we do not know of.

We should not test our God. We should not believe in false testimony about one and only loving God. God wants our hearts to be filled with goodness and only goodness brings us closer to Him.

We shall worship one God who is in heaven, Creator of everything. We should not misuse God's name or do any evil in His name

"Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves." Mathew 7:15

"A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit." Mathew 7:18

"Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, honor your father and mother,' and 'love your neighbor as yourself." Mathew 19:18-19
We should love and respect our parents. Moreover we should respect all
regardless elder or younger with whom we interact during our daily life.
We should not take another human's life. We should not even harm another human being.

We should not commit adultery i.e. cheat with our spouse. Jesus teaches us when we even look at a woman as an object of lust; it would be as much of a sin as adultery. We need to respect man and woman alike with full dignity. We should not steal, lie, cheat or provide false witness. We should love others and we should overcome anger, hate or greed.

"Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." John 14:27

God showed us path to peace through sacrifice, we need to remind ourselves every moment to live in peace and harmony by sacrificing in order to embrace his grace. Peace cannot be attained through argument, violence, fight and war.

On personal level, we should find peace in our heart. There will be confusion, doubts, conflicts of ideals and values in our mind, unless we remind ourselves to solve our inner quest through peace, we will never find a solution.

Within our family, we need to establish peace by accepting His teaching in our hearts and practicing them and reminding these teachings to ourselves for everything in our family life we deal with. That way a family can love each other, grow socially, intellectually and spiritually.

লেখা আহ্বান

"তেপান্তরী" তে ছাপানোর জন্য আপনার লেখা গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ছড়া, উপন্যাস আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

PBCA P.O. Box 1258, NewYork NY 10159

প্রবাসীর তথ্য পেতে ভিজিট করুন

www.PBCAusa.org

পুরোনো সে হারানো কথায়
প্রেক্ষাপটঃ খ্রীষ্টভক্ত সুহৃদ আর্চবিশপ টি,এ, গাঙ্গুলী

ডাঃ নেভেল ডিঃ রোজারিও, *ঢাকা, বাংলাদেশ*

পূণ্য পিতা পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট প্রথম বাঙ্গালী আর্চবিশপ টি,এ গাঙ্গুলী সিএসিসিকে এ বছর ধন্য ধন্যশ্রেণীভূক্ত হবার প্রাথমিক ধাপ হিসাবে ঈশ্বারের সেবক হিসাবে ঘোষনা করেছেন। ইতিহাসে কোন বঙ্গলীকে ধন্যশ্রেনীভুক্তকরন এটাই প্রথম। আজ থেকে ২৯ বছর আগে আকস্মিক হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। বাংলাদেশ মন্ডলীর প্রানপুরুষ আর্চবিশপ টি,এ গাঙ্গুলী সিএসসি। তাঁর সেদিনের আকস্কিক তিরোধানে হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল বাংলাদেশের তাবৎ মন্ডলী। প্রিয় ব্যক্তিদের ইহলোক থেকে আকস্মিক বিদায় কাথলিক মন্ডলীর আমাদের সবাইকে সেদিন মান্ডলিক অভিভাবক ও প্রগতি শূণ্যতায় ভারাক্রান্ত করে ফেলেছিল। কেননা জাতি, সম্প্রদায় ও মন্ডলীর সবার প্রগতি ও মঙ্গল কামনায় জীবনভর সাধনা করেছেন প্রয়াত আর্চবিশপ টি, এ, গাঙ্গুলী সিএসসি। তাঁর সাধারন ফল্গুধ-ারায় আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মান্ডলিক জীবন আজ ফলে ফুলে বিকশিত। ব্যক্তিগতভাবে তো বটেই সামাজিক ও মান্ডলিক বেশ কিছু কর্মকান্ডে, খ্রীষ্টভক্তদের যে কোন প্রয়োজনে তাঁর সহযোগিতা, সহমর্মীতা চিরস্বরণীয় হয়ে থাকবে যুগকে যুগান্তরে---প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।

রমণা গির্জায় সে সময়কার অনুষ্ঠিত তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার হিন্দু, মুসলামান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ধর্মনির্বিশেষে শোকে মূহ্যমান লাখো মানুষের নেমেছিল ঢল। ঠিক তেমানি ভাবে তাঁর ২৯ তম মৃত্যু বাষিকীতে রমণা ক্যাড্রিালে যখন আয়োজন করা হ'ল তাঁকে 'ঈশ্বরের সেবক ঘোষনার, তখন কোন প্রকার আমন্ত্রন ছাড়াই ঝড় বৃষ্টিকে অপেক্ষা করে সেদিন নেমেছিল উপচেপড়া মানুষের ঢল। এটাই স্বাভাবিক। কেনানা তিনি যে তাঁর অগণিত ভক্ত শুভানুধ্যায়ীর ভালবাসায় সিক্ত হয়ে আছেন। তার যে তিরোধানের পর থেকেই লাখো লাখো ভক্তের হৃদয়ে তিনি বেঁচে আছেন চিরকাল, আর তাদের ভালবাসায় সিক্ত হবেন আরও অনন্তকাল ধরে।

ইতিহাসে পাতায় যে সব বিরল ব্যক্তিত্ব তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টায় বাংলাদেশের খ্রীষ্টভক্ত এবং জনগনের কাছে অমর হয়ে আছেন। আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি তাঁদের অন্যতম। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন সময় থেকে এ মহান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আসার। আরও সুযোগ হয়েছিল কলেজ জীবন সুহৃদ সংঘ, খ্রীষ্টান ছাত্রকল্যাণ সংঘ সহ বিভিন্ন যুব ছাত্র আন্দোলনে জড়িত থাকাকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে তার কাছে যাবার। তাঁকে চিনেছি ছাত্র জীবনে, স্বাধীকার আন্দোলনে উনসত্তুরের উত্তাল সে দিনগুলিতে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুর্ণগঠনে বিশ শতকের মধ্যে ষাট থেকে সত্তর শতকের শেষাংশ পর্যন্ত। ছাত্র ও যুবক অবস্থায় অনেকের মতই আমি ও ছিলাম তার সাথে অচ্ছেদ্য বন্ধনে। আমার সে সব পুরানো স্মৃতিকে সম্বল করে আমি আজকের এ শুভাক্ষনে আমার ছোট্ট ক্যানভাসে চিত্রিত করার চেষ্টা করবো ছাত্র যুবকসহ সাধারন খ্রীষ্টভদের আর্চবিশপ গাঙ্গুলীকে। আর্চবিশপ মহোদয়ের জাতীয়, মান্ডলিক ও ব্যক্তিগত স্মৃতিগুলো আমার কাছে একাকার হয়ে গেছে বলেই ব্যক্তিগত এ স্মৃতিচারন রোমন্থনের জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি শুরুতেই।

ষাটের দশকের শেষের দিকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আপামার জনসাধারণ যখন বাঙ্গালী জাতীতাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধিকার অর্জনের আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছিল তখন প্রতিফলনও পড়ে ঢাকার তৎকালীন ক্ষুদ্র খ্রীষ্টান যুব ও ছাত্রদের মাঝে। খ্রীস্টান সমাজকে এদেশের মাটিতে প্রোথিত করে এদেশের বৃহত্তর জনগনের সাথে সম্পৃক্ত করার সৎ সাহস নিয়ে এগিয়ে আসে তখনকারই খ্রীষ্টান যুব ছাত্র সমাজ। সুহৃদ সংঘ, ত্রিবেণী ছাত্রকল্যাণ সংঘ, খ্রীষ্টান ছাত্রকল্যাণ সংঘ, বাংলাদেশ সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠতে থাকে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ খ্রীষ্টান যুব ও ছাত্র সংগঠন সংগঠন সমূহ।

খ্রীষ্টান যুব সম্প্রদায় এবং ছাত্র ছাত্রীরা অনুভব করে যে, নিজারা সংঘবদ্ধ হয়ে সমাজকল্যাণ সমাজসেবা ও সমাজ সংস্কারমূলক কাজে এগিয়ে আসার জন্য একটা খ্রীষ্টান যুব সংগঠন থাকা আবশ্যক, যেখানে খ্রীষ্টায় আর্দশ ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতিফলনের পাশাপাশি গড়ে তোলা যাবে জাতীয় চেতনা বোধ । সামাজিক অন্যয় অবিচার রোধের পাশাপাশি রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার আদায়ের দাবীতে খ্রীষ্টান ছাত্র সমাজ হতে পারবে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদী। ১৯৬৯ সনের লক্ষীবাজারে গড়ে উঠে ঢাকার খ্রীষ্টান যুব প্রতিষ্টান সুহৃদ সংঘ। ১৯শে এপ্রিল ১৯৭০ সালে আগুত সাধারণ সভায় প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র অনুমোদনের মাধ্যমে জন্ম নেয় আজকের খ্রীষ্টান ছাত্রকল্যাণ সংঘ, বাংলাদেশ। দুমাসব্যাপী এড হক কমিটির সব সভা এবং পরবর্তিত গঠিত কার্যকরী পরিয়দের সব সভা রমনা আর্চবিশপ হাউজের পার্লারে অনুষ্ঠানের শুধু অনুমতি নয়, বরং প্রতিটি সভায় আমরা আপ্যায়িত হবার যেন তাঁর একটি অলিখিত নির্দেশও ছিল। ষাটের দশকের শেষ ভাগে এবং সত্তরের প্রথম ভাগে গড়ে ওঠা এ সব যুব ও ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠার ব্যাপারে তখনকার আর্চবিশপ টি,এ গাঙ্গুলীর মনোভাব এবং সাহায্য সহযোগিতা ছিল আশাতীত ও স্মরণীয়।

মানবিক গুনের অধিকারী ছাত্রসুহৃদ আর্চবিশপ ঃ

প্রকৃতি ধর্মভিত্তিক নৈতিকতার সঙ্গে আচবিশপ গাঙ্গুলীর ছিল নিবিড় সর্ম্পক। তাঁর বাইরের পোষাকী আবরনটি ধর্মীয় লেবাসে আবৃত হলেও ভেতরটা ছিল প্রগতিশীল কণ্ঠস্বরে ভরা, মুক্তিচিন্তা ও বিজ্ঞানভিত্তিক নৈতিকদাবোধের দ্বারা চালিত আর্থ-সামাজিক ও সংস্কৃতি পরিমন্ডলের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রচনার ঝান্ডা সমুন্নত রাখার দিক নির্দেশনাময় ।

সুঠামদেহী মাঝারী আকারের হালকা পাতলা গড়নের মানুষ ছিলেন আর্চবিশপ গাঙ্গুলী কিন্তু তার হাসিটা ছিল বিরাট। কোনদিন কাউকে ধমক দিয়ে কথা বলতে শুনেনি কেহ তাঁকে। অথচ তাঁর ব্যাক্তিত্ব ছিল অত্যন্ত সবল। স্বল্পভাবী কিন্তু বহুভাষাবিদ সুলেখক, সুগায়ক ও সুবক্তা আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর সৎপথে থেকে একটা আদর্শ এবং লক্ষ্যের ভিত্তিতে পথ চলা পছন্দ করতেন। বাঙ্গালী যাজকদের মধ্যে প্রথম পিএইচডি ডিগ্রীধারী বিনয়ী আর্চবিশপ গাঙ্গুলী ছিলেন ছাত্র ছাত্রীদের অতি প্রিয়। আজীবন ছাত্র ছাত্রীদের কল্যাণ কামনায় উদগ্রীব ছিলেন আর্চবিশপ গাঙ্গুলী। তিনি নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবেও দক্ষতা সুনাম ও সম্মান অর্জন করেন। আর্চবিশপ গাঙ্গুলী একজন বিজ্ঞ, দুরদশী চিন্তবীদ ও নিরলস কর্মী ছিলেন। দুরদৃষ্টি ছিল বলেই তিনি একজন আর্দশ মানবিক মূল্যবোধের মহান ব্যক্তিত্ব হিসাবে আজও চিহ্নত হয়ে আছেন। তাঁর কাছে যারাই যেত উনি তাদের কথা বিস্তারিত শুনতেন, আলোচনা করতেন, সুখ-সুবিধা দেখতেন, অসুবিধাগুলো অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন -- সর্বোপরি যেখানে যা প্রয়োজন সেখানে সে পরামর্শ ও নির্দেশ দিতেন। আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একটি বিশেষত্ব ছিল যে তার সাহাচর্যে আসা ছাত্র ছাত্রী, সহকর্মী, অনুরাগী, এমনকি বিরাগী নির্বিশেষে সবাইকে চমৎকিত করতে পারতেন। আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর মধ্যে সব সময় একটি প্রচন্ড ইতিবাচক মোহনীয় আর্কষন ছিল, যা তাঁকে মহীয়ান করে রেখেছে মৃত্যুর এত বছর পরেও তিনি আজ এত বছর পরেও অমর হয়ে আছেন তার র্কম কীর্তির মধ্যে দিয়ে। সর্বগুণে গুণবান আর্চবিশ গাঙ্গুলী মানব সেবায় আর্দশ যুগ যুগ অনুপ্রেরণা দিয়ে যাবে অনাগত দিনের মানুষকে।

খ্রীষ্টান ছাত্রাবাস, ছাত্রকল্যাণ সংঘের আন্দোলন ও আর্চবিশপ ঃ

নটরডেম কলেজের খ্রীষ্টান ছাত্রাবাসে ঢাকা শহরের বাইরের ছাত্ররা থাকতো। ১৯৭৩ সনে এ ছাত্রাবাস হঠাৎ করে বন্ধ করে সবাইকে অমানবিকভাবে রাস্তায় বের করে দেয়ার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সমস্ত খ্রীষ্টান সমাজে এবং ছাত্রকল্যাণ সংঘে। চাপা বিক্ষোভে ও প্রতিবাদে ফেটে পড়লো ছাত্র কল্যাণ সংঘ। ১৯৭৫ সনে ছাত্রকল্যাণ প্রকাশ করে তার মাসিক মুখপত্র অনল। অনলের জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিটি সংখ্যায় প্রাধান্য পেতে থাকে খ্রীষ্টান ছাত্র ছাত্রীদের প্রানের দাবি হোস্টেল সমস্য। '৭৫এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ত্রিবেনী ছাত্র কল্যাণ সংঘের বার্ষিক সাধারন সভার খ্রীষ্টান ছাত্র কল্যাণের তৎকালীন সভাপতি নেভেল ডিঃ রোজারিও এর "এবার আর এককভাবে নয় আসুন সমবেত ভাবে হোষ্টল সমস্যা সমাধান করি"র আহবানে ১৩ই এপ্রিল ছাত্রকল্যাণ সংঘের সভাপতি নেভেল ডিঃ রোজারিওকে আহবায়ক করে বিভিন্ন সংঘ সমিতির সমন্বয়ে গঠন করা হয় 'সম্মিলিত (সর্বদলীয়ভাবে) হোষ্টেল বাস্তবায়ন কমিটি। (অনল ঃ ১ম বর্ষ ঃঃ ২য় সংখ্যা)।

সর্বদলীয় হোষ্টেল বাস্তবায়নে কমিটি বিভিন্ন পদক্ষেপের পাশাপাশি অনলের তৃতীয় সংখ্যায় হোষ্টেল ইস্যুটাকে সামনে রেখে সুবল এল, আর আকলো কার্টুন ---- গাধার পিঠে লম্বা নাকওয়ালা মানুষের নাগালের বাইরে নাকের ডগায় বাঁধা মুলো। ভাবখানা এই যে, নাগালবিহীন মুলোরুপী খ্রীষ্টান ছাত্রাবাস এর প্রতাশায় গাধারুপী ছাত্র ছাত্রী ধাবমান থাকবে অনাদিকাল পর্যন্ত। হয়তো দারুন কটাক্ষ ছিলো সে কার্টুনে কিন্তু সে সময়কার ছাত্র ছাত্রীদের মনের কথাই প্রতিফলিত হয়েছিল সে সংখ্যার সে অনলে। কটাক্ষ ছিলো প্রচান্ড --- তাই সবাইকে মহল বিশেষের কাছ থেকে যথেষ্ট তিরস্কার ও ধমক সহ্য করতে হয়েছিল। অথচ সে কার্টুনটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি যার প্রতিক্রিয়া জানানোর কথা, সে ধর্মাধ্যক্ষ আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর ছিল না কোন ক্ষোভ, প্রকাশ পেল না কোন আক্রোশ। বরং ক্ষমাশীল প্রভুর মত ছাত্র-ছাত্রীদের মঙ্গল কামনায় একই বছর মোহাম্মদপুরে আর্চ-ডায়োসিসের জমি ছাত্রদের হোষ্টেলের জন্যে দান করে গেলেন। পর্যায়ক্রমে ঢাকার ছাত্রী হোষ্টেল নির্মাণের চিন্তা ও কারেছিলেন তিনি।

হোষ্টেল কমিটি, সর্বদলীয় হোষ্টেল বাস্তবায়নে কমিটি ও সাধারন খ্রীষ্টভক্তদের দাবী এবং ছাত্রদের কল্যাণের কথা চিন্তা করে '৭৫ সনের ১ম শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ

(প্রতিভার অন্বেষণ) অনুষ্ঠানের শেষদিন পুরুস্কার বিতরণী অনষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে দুরদৃষ্টিসম্পন্ন পন্ডিত শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ গাঙ্গুলী ঘোষণা দেন, "মোহাম্মদপুরে যে ডায়োসিসের সম্পত্তি রয়েছে সেখানে ছেলেদের জন্য হোষ্টেল করে দেয়া হবে"। প্রভু আর্চবিশপ তাঁর ভাষণে ছেলেদের জমি দেওয়ার কথা বলেন। (প্রতিবেশী রিপোর্ট, ২৬ শে অক্টোবর, ১৯৭৫)।

এ ঘোষণার পরেও এ কাজে বিদেশী দাতা না পাওয়াতে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী তাঁর জীবদ্দশায় এ হোষ্টেলের নির্মাণ কাজে এগুতে পারেননি। ছাত্রদের হোষ্টেলের জন্য তিনি অনলস ও অব্যাহত ভাবে বিভিন্ন দাতাদের সাথে যোগাযোগ করতে থাকেন। পাশাপাশি ছাত্রদের এ আবাসন সম্যস্যার জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষক ডঃ বেনেডিক্ট গমেজ, আলেকজান্ডার রোজারিও, নিকোলাস গমেজ প্রমুখদের নিয়ে গঠিত হোষ্টেল কমিটি মারফত ভাড়া করা হোষ্টেলে আর্থিকসহ সার্বিক সহযোগিতা দেন। আর্চবিশপ মহোদয়ের আন্তরিক চেষ্টা স্বত্ত্বেও কোন বিদাশী অনুদান না পাওয়াতে সর্বদলীয় হোষ্টেল বাস্তবায়ন কমিটি স্থানীয় ভাবে অর্থ সংগ্রহ করে হোষ্টেল নির্মাণের পরিকল্পণা আর্চবিশপ মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করে। পরিকল্পনায় বছরের একটি বিশেষ রোববারকে ছাত্র দিবস হিসাবে ঘোষনা দিয়ে বাংলাদেশের সমস্ত গীর্জায় সংগৃহীত রবিবাসরীয় দানের সঙ্গে বিশেষ দান সংগ্রহের পাশাপাশি বিভিন্ন খ্রীষ্টিয় প্রতিষ্ঠান, NGO, বিত্তবান লোকদের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহ করার প্রস্তাব করা হয়। আর্চবিশপ মহোদয় তখনকার ৪ ডায়োসিসের বিশপদের সভায় তা আলোচনার আশ্বাস দেন। পরবর্তীতে বিশপ সম্মেলনে ঢাকার বাইরের এক ডায়োসিসের বিশপের আপত্তি ও অনাগ্রহের কারণে তা আর হয়ে উঠেনি।

আর্চবিশপের সহানুভূতিশীলতায় ছাত্রদের মরণোত্তর শ্রদ্ধা ঃ

উপরিলি-খিত কারণে ছাত্রদের জন্য প্রস্তাবিত হোষ্টেল আর্চবিশপ গাঙ্গুলী আর শুরু করে যেতে পারেন নি। কিন্তু ছাত্রকল্যাণ সংঘ বরাবরই স্মরন করেছে এবং সম্মান দেখিয়েছে তাদের পরম সুহৃদ, পৃষ্টপোষক ও ছাত্র কল্যাণ সংঘের জন্ম থেকে হিতাকাঙ্খী বন্ধুকে বিশেষতঃ অনলের বিভিন্ন বিশেষ সংখ্যায়। সে অনুভুতির প্রকাশ পায় আর্চবিশপ মহোদয়ের মৃত্যুর পরে ৭৭ সনে প্রকাশিত ৩য় বর্ষ বড়দিন সংখ্যা অনলে। অন্তিম শয়নে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর মরদেহের ছবির নীচে অনল সম্পাদকীয় পরিষদ ও খ্রীষ্টান ছাত্রকল্যাণ সংঘের পক্ষে সংখ্যাটি প্রয়াত আর্চবিশপের স্মরণে উৎসর্গ করে ক্যাপসান জুড়ে দেয়া হয়।

"এবারেই তিনি প্রথম আমাদের মাঝে নেই
অথচ তিনি ছিলেন এ যাবৎ
ছিলেন আমাদের একজন হিতাকাঙ্খী, বন্ধু
এবং প্রধান পৃষ্টপোষকরুপে সুদীর্ঘকাল।
আমরা তাঁকে শ্রদ্ধার্হ চিত্তে স্বরণ করি
আজীবন করতেও চাই
কোন আনুষ্ঠানিকতার গদবাঁধা ছাঁচে নয়
বরং আমাদের কচি হাতের বিভিন্নতায়
আমরা তাঁর জীবিত আত্মায় বিশ্বাসী
এবং আশীর্বাদের প্রত্যাশী"॥

ছোট বড় সব ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আর্চবিশপ টি,এ, গাঙ্গুলীর আন্তরিকতাপূর্ন ও সহানুভূতিশীল সর্ম্পকের কারণে তখনকার ছাত্র ছাত্রীদের মনে তিনি পেয়েছিলেন বিশেষ আসন। আর তাইতো ছাত্রদের প্রাণের দাবী বাস্ত বায়িত না হলেও শ্রদ্ধা জানাতে এক ফোটা কৃপণতাও প্রকাশ পায়নি তাদের মনে। ছাত্র ছাত্রীদের এ মনোভাব খানা রিলে রেসের বাটন হস্তান্তরের মত করেই পরবর্তীতে আসা নতুন প্রজন্মের ছাত্র ছাত্রীদের মনে পৌছাতে পেরেছিল অগ্রজরা বছরের পর বছর ধরে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। বছরের পর বছর প্রতিটি প্রতিভার অন্বেষণের শেষদিনে আর্চবিশপ মহোদয়ের আত্মার কল্যানে খ্রীষ্টাবাগ ও কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন রীতিমত রেওয়াজ হয়ে দাড়িয়েছিল। ১৯৯৪ সনে ছাত্রকল্যাণের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর কবরে জড়ো হয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলী জানাতে দেখেছিলাম এক বৃহৎ ছাত্র জনতাকে যাদের অনেকের জম্ম হয়েছিল আর্চবিশপ মহোদয়ের মৃত্যুর পরে। অনল এবং ছাত্রকল্যাণ সংঘের কর্মকর্তা ও সদস্য-সদস্যাদের মাঝে শ্রদ্ধের আর্চবিশপ গাঙ্গুলী ও খ্রীষ্টান ছাত্রাবাস সমস্যা এমন প্রভাব ফেলেছিল যে একই সংখ্যায় বড়দিনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপনেও একই বিষয় চলে আসে।

'এবারের বড়দিনে ও নববর্ষ
বাংলাদেশের খ্রীষ্টান ছাত্র-ছাত্রীদের
জীবনে নিয়ে আসুক
আমাদের পৃষ্টপোষক ও হিতাকাঙ্খী বন্ধু
আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর স্বপ্ন ----
স্থীয় হোষ্টেল বাস্তবায়নের
উজ্জ্বল সম্ভবনা॥

তাঁর সে অসমাপ্ত কাজ
আমারা সমাপ্ত করবোই ----
এ হোক আমাদের এ শুভুদিনে
আপনার, আমার
সবার দৃপ্ত শপথ'॥

প্রতিভার অন্বেষণ, ছাত্রকল্যাণ ও আর্চবিশপ গাঙ্গুলী ঃ

সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার ও সামাজিক অবক্ষয় রোধের প্রাথামিক শর্ত সবাইকে সংস্কৃতিমনা করে তোলা। সে সময়কার খ্রীষ্টানদের মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা তেমন ছিল না। একদিকে ছিল পর্যাপ্ত সুযোগের অভাব, অন্যদিকে নিজেদের মধ্যে অনুশীলন ও পরিশীলনের আগ্রহের অভাব। এমনি এক অবস্থায় খ্রীষ্টান সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টিতে ১৯৭৫ সনে আয়োজন করা হয় প্রথম শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ। ৭৫ এর সে প্রথম অনুষ্ঠানের শেষদিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভ্যাটিক্যানের রাষ্ট্রদুত মহামান্য আর্চবিশপ (পরবতীর্তে কার্ডিনাল) এডওয়ার্ড ক্যাসিডি। বিশেষ অতিথি ছিলেন আর্চবিশপ টি,এ, গাঙ্গুলী। পুরস্কার বিতরণী সভায় সংঘের সভাপতি নেভেল ডিঃ রোজারিও প্রতিযোগিতামূলক এ ধরনের কর্মসুচী মান্ডলিকভাবে সারা বাংলাদেশ জুড়ে গ্রহন করার জন্য আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর নিকট অনুরোধ রাখেন। বিশেষ অতিথি তাঁর ভাষনে বলেন, "এতদিন ইচ্ছে থাকলেও উপায় ছিল না যুব সম্প্রদায়ের সমস্যা তলিয়ে দেখার। এবার থেকে একজন যাজক থাকবেন যুব সম্প্রদায়ের পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী রুপে"।

পচাত্তুরে শুরু করা প্রতিভার অন্বেষণ, শত ঘাত-প্রতিঘাতের মুখেও টিকে থেকে ৩২ বছর পর ২০০৬ এ পালন করছে ত্রিশতম প্রতিভার অন্বেষণ। ঢাকা কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান হলেও প্রথম বছর থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেকেই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে প্রায় প্রতিবছরই। প্রতিযোগিতামূলক এ অনুষ্ঠানটি নতুন প্রজন্মের প্রতিভা উন্মেষের ক্ষেত্রকে করেছে আরও প্রসারিত। আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর বিশ্বাস করতেন যে, সাধা-রন মানুষের সক্ষমতা এবং মানবিক অর্জনগুলো সাংস্কৃতিক ভাবনায় যুক্ত করতে হবে। আমাদের সম্প্রদায়ে প্রচালিত প্রাচীন বদ্ধমুল চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা, প্রবৃত্তি দিয়ে এ পরিবর্তনশীল বিশ্বকে বোঝা যে কোনভাবেই সহজ কাজ নয় তা ঠিকই তিনি অনুভব করেছিলেন। আর এটা মনে প্রানে বিশ্বাস করতেন বলেই তাকে দেখেছি প্রথিভার অন্বেষণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন যুব সংগঠনগুলোকে বিভিন্ন কর্মকান্ডে উৎসাহিত করতে। ছাত্র সম্প্রদায়কে তিনি শিক্ষার পাশাপাশি মুক্তমনের অধিকারী এবং সংস্কৃতিমনা হতে উৎসাহিত করতেন সব সময়।

সংস্কৃতি-মনা আর্চবিশপ গাঙ্গুলী ঃ

সুহৃদ সংঘের জন্মের পর তাদের প্রথম নাটক মঞ্চায়নের জন্যে বেছে নেয়া হ'ল কল্যাণ মিত্রের 'কুয়াশা কান্না' নাটকটি। নাটকটি পরিচালনার ভার দেয়া হল সুহৃদ সংঘের অন্যতম উপদেষ্টা মিঃ হেবল ডিঃ ক্রুজকে। সহকারী পরিচালনায় ছিলেন সুহৃদ জর্জ ডিঃ রোজারিও এবং সংগীত পরিচালনায় ছিলেন সুহৃদ দীপক বোস। সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে স্কুলে একটি ক্লাস রুমে শুধু হল রিহ্যারসেল প্রতিদিন সন্ধ্যায়। সামাজিকতায় বিরুপ ধারনা ও পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার কারনে সে সময় মহিলা চরিত্রে অভিনয় করার জন্য আজকালকার মত সৌখিন মহিলা অভিনেত্রী পাওয়া যেতনা বললেই শুধু নয় বলতে হয় রীতিমত দুস্প্রাপ্যও ছিল। আবার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অভিনেত্রী আনার আর্থিক সঙ্গতি ছিল না সংঘের। সুহৃদ সংঘের এ দুযোগ কালে সাহস করে সেদিন এগিয়ে এসিছিলেন সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার স্কুলের দুজন শিক্ষিকা মিস এগনেস এবং মিস পুস্প গমেজ। কিন্তু পাল-পুরোহিত সরাসরি জানিয়ে দিলেন মহিলা নিয়ে কোন নাটক করা যাবে না। মহিলা চরিত্রে পুরুষকে মহিলার মেকাপ দিয়ে শাড়ী পড়িয়ে অভিনয় করাতে হবে। ১৯৬৯ এর গোড়ার দিকে খোদ ঢাকা শহরে মহিলা চরিত্রে পুরুষকে মহিলা সাজিয়ে নাটক মঞ্চয়ণ ২০০৬ এ এসে অবিশ্বাস্য ঠেকলেও সেদিনকার মান্ডলিক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের সেটাই ছিল আসল চেহারা ---- সেটাই ছিল বাস্তবাতা। সুহৃদ সংঘ নিছক একটা ক্লাব, সংঘ বা সমিতি বলতে যা বুঝায় আদতে তা ছিল না বরং এ ছিল একটি আন্দোলন। এ আন্দোলন ছিল শেকড়ের অন্বেষণের পাশাপাশি খ্রীষ্টান সমাজে প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত অন্যয় অবিচারের বিরুদ্ধে স্বোচ্চার প্রতিবাদী কণ্ঠ এবং সমাজে বহমান বিপরীতমুখী স্রেতধারার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তা পাল্টানোর একটি সমবেত সাহসী পদক্ষেপ। তাই সুহৃদ বাহিনী এটাকে সহজভাবে মেনে না নিয়ে দ্বারস্থ হলো আর্চবিশপ গাঙ্গুলী মহোদায়ের নিকট। আর্চবিশপ মহোদয় ধৈর্য্য সহকারে ক্ষুব্দ এবং আবেগপ্রবণ যুবক দলের সব কথা শুনলেন এবং গ্রামের জন্য প্রচলিত এ ব্যবস্থা শহরের জন্যে কোনমতেই প্রযোজ্য নয় বলে আমাদেরকে নাটকের মহড়া চালানোর পরামর্শ দিয়ে যথাস্থানে নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন। সুচিন্তাবিদ, সংস্কৃতিবান ও সংস্কৃতিপ্রাণ, দুরদৃষ্টিসম্পন্ন জ্যোর্তিময় এ মহাপুরুষের সেদিনের সে সিদ্ধান্ত মান্ডলিক পসাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে এক মাইলষ্টোন হিসেবে চিহ্নিত হবার দাবী রাখে।

একুশে ফেব্রুয়ারী ও আর্চবিশগ গাঙ্গুলী ঃ

বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষা মাতৃভাষাকে পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবীতে বুকের রক্ত ঢেলে আত্মাহুতি দিয়েছিল ভাষা শহীদরা ১৯৫২ সনে। বাংলার সে সব দামাল ছেলেদের স্মরণে ছাত্র-ছাত্রীরা এর পর থেকে প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারীকে পালন করতো শহীদ দিবস হিসেবে। স্বাধীনতা পরবর্তী কালের এখনকার মত এতটা সার্বজনীতা ২১শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্থানী আমলে তখনও পায়নি। ছোটকাল থেকে প্রতিবছর শহীদ দিবস উদযাপন এর কর্মসুচীতে দেখতাম ভাষা শহীদদের আত্মার কল্যাণার্থে মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা এবং গীর্জায় উপসনার ব্যবস্থা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কোন গীর্জায় এ ধরনের কোন প্রর্থনা হতে দেখিনি। উনসত্তুরের গণ-আন্দোলন শেষে সত্তুরের শহীদ দিবসে ঢাকার যুব

প্রতিষ্ঠান সুহৃদ সংঘ লক্ষীবাজার গীর্জায় আয়োজন করলো ভাষা শহীদের আত্মার মঙ্গলার্থে খ্রীষ্টবাগ ও বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠানের। পরিকল্পনা করা হলো 'আমারে ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলতে পারি' গানের মাঝে পুরোহিত খালি পায়ে কালো বা বেগুনী রংয়ের পোষাক (যা শোকের অর্থ বহন করে) পড়ে সেবকসহ বেদীতে প্রবেশ করবে। গির্জার বেদীর দু'পাশে রাখা বড় বিশেষ ধুপ-ধানী থেকে আসবে সুগন্ধী। খ্রীষ্ট ভক্তরা খালি পায়ে কালো ব্যাজ পরে আগেই গির্জায় প্রবেশ করবে। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' এবং 'ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' গান দু'টি পর্যায়ক্রমে গাওয়া হবে গীর্জার ভিতরে। ধর্মপল্লীর তৎকালীন এদেশীয় স্থানীয় পাল-পুরোহিতের কাছ থেকে আসলো অপত্তি। পুরোহিত খালি পায়ে বেদীতে কিছুতেই আসবেন না । আরও জানালেন কালো বা বেগুনী রংয়ের কাপড় যাতনাভোগকালীন সময়কার অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য কোন সময় পড়া যাবে না । গীর্জার গান ছাড়া প্রস্তাবিত অন্য কোন গান গাওয়া চলবে না এবং খ্রীষ্টভক্তরাও কালো ব্যাজ বুকে নিয়ে আসতে পারবে না গীর্জায়। পাল-পুরোহিতের এ ধরনের অবস্থান গ্রহণে হতবাক সবাই। উপায়ন্তর না দেখে দ্বারস্থ হ'লাম আর্চবিশপ মহোদয়ের। সব কিছু শুনে সময়ের প্রয়োজনে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তটি নিলেন তিনি। সিদ্ধান্ত দিলেন শেষের গান দু'টি খ্রীষ্টযাগের শেষ আশীর্বাদের পরে গাওয়া হবে। সেদিন সে যুগসন্ধিক্ষণের সে যুগান্ত কারী সিদ্ধান্তের কারণেই প্রথমবারের মত ভাষা শহীদদের আত্মার কল্যাণার্থে বর্তমান বাংলাদেশ মন্ডলীতে প্রথমবারের মত উৎসর্গ হয়েছিল খ্রীষ্টযোগ এবং প্রথমবারের মত গীর্জার ভেতরে গাওয়া সম্ভব হয়েছিল উলে-খিত গান তিনটি। সুহৃদ শিল্পীদেরকে প্রস্তুত করানোতে ও গীর্জার ভেতরে সুহৃদ শিল্পী দলের সাথে কণ্ঠ দিতে সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন বাফার শিক্ষক মিঃ মনসুর এবং বর্তমানে কালের খ্যাতিমান রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী মিতা হক। সেদিন গাওয়া তিনটি গানই বর্তমানে গীর্জায় ব্যাবহৃত গীত-বিতানে অর্ন্তভূক্ত এবং বহুল গীত। যার মধ্যে একটি আবার পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতে। ১৯৭০ এর ফেব্রুয়ারীতে সৃহৃদ সংঘ খ্রীষ্টভক্তদের নিয়ে মন্ডলীর ইতিহাসে প্রথমবারের মত প্রভাতফেরী বের করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পন করে। সুহৃদ সংঘের সে প্রভাতফেরীর পুরোভাগে সেদিন যোগ দিয়েছিলেন উপমাহাদেশের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ সুহৃদ উপদেষ্টা প্রয়াত সময় দাস । পরের বছরে সুহৃদ সংঘের প্রভাতফেরীতে যোগ দেয় রমনা ও তেজগাঁয়ের খ্রীষ্টভক্তরা। এ ঘটনার পর থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শুরু হয় আঞ্চলিকভাবে শহীদ দিবস পালন।

যুববান্ধব আর্চবিশপ গাঙ্গুলী ঃ

আগেই বলেছি, সামজিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার ও সামাজিক অবক্ষয় রোধের প্রাথমিক শর্ত সবাইকে সংস্কৃতিমনা করে তোলা । খ্রীষ্টান সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টিতে ১৯৭৫ সনে খ্রীষ্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘ আয়োজন করে ১ম শিক্ষা ও সাংস্কৃতি সপ্তাহ (যা পরবর্তীতে নাম ধারন করে 'প্রতিভার অন্বেষন')। '৭৫ এর সে প্রথম অনুষ্ঠানের শেষদিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আর্চবিশপ টি,এ, গাঙ্গুলী। পুরুস্কার বিতরনী সভায় বিশেষ অতিথি তাঁর ভাষনে যুব সম্প্রদায়ের পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী নিযুক্ত করার ঘোষনা দেন। (প্রতিবেশী রিপোর্ট, ২৬ শে অক্টোবর, ১৯৭৫)। ১৯৭২-৭৩ সনে তাঁরই উদ্যোগে প্রথমবারের মত ৩ জন ছাত্র-যুব নেতা সৃহৃদ সংঘের প্রথম সভাপতি সুহৃদ হিউবার্ট অরুব রোজারিও, খ্রীষ্টান ছাত্রকল্যাণ সঙঘের প্রথম সভাপতি মিঃ চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু এবং আদিবাসী যুব নেতা মিঃ হারু টিক্ক কে 'নেতৃত্ব প্রশিক্ষন' এর জন্যে বিদেশ পাঠানো হয়। বাংলাদেশ মন্ডলীর জন্যে এ উদ্দ্যোগই প্রথম এবং শেষ। এর পরে আর এ ধরনের আর কোন উদ্দ্যোগই নেয়া হয়নি পরবর্তীকালে।

বত্রিশ বছর আগে ছাত্র-যুবকদের প্রথম শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা '৭৫ এর পুরস্কার বিতরনী সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে এসে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী যুব সম্প্রদায়ের পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী রুপে একজন যাজক নিয়োগের আশ্বাস দিলেন ---- আর সে আর্চবিশপের মৃত্যুর ২৯ বছর পরে আর্চবিশপের সে যুব সম্প্রদায়ের পরমর্শদাতা ও সাহায্যকারীর বদলে কাথলিক যুব কমিশন --- ইয়ুথ টিম -- সেবা দল থেকে --- বর্তমানে আবার সিবিসিবি যুব কমিশন নাম নিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে ও রং বদলিয়ে পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী না হয়ে --- পরিনত হয়ে দাড়ালো অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র-যুব আন্দোলনে বিভেদকারী, প্রতিযোগী ও ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিপক্ষ হিসেবে।

মুক্তিসংগ্রাম ও যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পূর্নগঠনে আর্চবিশপ ঃ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে শুধু করা বাঙ্গালী জাতির অহংকার মহান মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসকালে তিনি বিভিন্ন খ্রীষ্টান প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য ও আশ্রয় দে'য়া হয়। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ যুদ্ধাহত সবার চিকিৎসা যেন নিশ্চিত করা হয়। শুধু তাই নয়, নিজের জীবন বিপন্ন করে দেশের বিভিন্ন স্থানে পায়ে হেটে, সাইকেল চেপে টাকা পয়সা এবং খাবার পৌছে দিতেন আক্রান্তদের কাছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলায় ফিরে এলেন তখন এ মহাপুরুষকেই দেখি তাঁর নিজের গলার চেইন তুলে দিতে জাতির জনকের হাতে এবং শুনি বলতে যে এটা বিক্রি করে ক্ষতিগ্রস্থদের কিছুটা হলেও সাহায্য করা যাবে। তার সদ-ইচ্ছা ও আগ্রহের কারনেই বিস্তার ও বিস্তৃতি লাভ করে CRS, CORR & CARITAS এর মত সাহায্য ও উন্নয়ন সংস্থা যে সংস্থাগুলো বাংলাদেশ গড়ে তোলায় অবদান রাখার জন্যে প্রশংশিত এবং সমাদৃত হয়েছে সর্বপর্যায়ে। মানুষের প্রতি ভালবাসার কারনেই মানবতাকামী এ মহাপুরুষকে তালিকাভুক্ত করেছিল স্বাধীনতার শত্রুরা বুদ্ধিজীবি তালিকায় তাঁকে শেষ করে ফেলার জন্যে।

ঢাকার দু'টি খ্রীষ্টান কম্যুনিটি সেন্টার ও আর্চবিশপঃ

বাংলাদেশের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের যারা ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করতেন তাদের দেখা সাক্ষাৎ এবং মিলনমেলার তীর্থস্থান ছিল গীর্জা প্রাঙ্গন। সাধারনতঃ ধর্মানুরাগী খ্রীষ্টভক্তগন রবিবারে বিভিন্ন (তখন সারা ঢাকা শহরে সর্বসাকুল্যে গির্জা ছিল মাত্র তিনটি) গির্জায় অনুষ্ঠিত খ্রীষ্টযাগে অংশ নিতেন। অনেকে যারা পরিবার পরিজন গ্রামে রেখে কার্যোপলক্ষ্যে ঢাকার থাকতেন তারাও সবাই সাপ্তাহিক ছুটির আগের দিন রওনা দিতেন গ্রামের পথে। তাই রোববার খ্রীষ্টযাগ শেষে সীমিত সময়ের জন্য অল্পসংখ্যাক খ্রীষ্টভক্তদের সাথে দেখা সাক্ষাতের মধ্যেই সিমাবদ্ধ ছিল ঢাকার সামাজিকতা। তাই প্রায় সবার সামজিক কর্মকান্ড হয়ে পড়ে 'রবিবাসরীয় খ্রীষ্টান' দের মতও অনেক ক্ষেত্রে একদিনব্যাপী। এসংকীর্ণ বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে খ্রীষ্টভক্তরা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো একটি কম্যুনিটি সেন্টারের। সবাই দ্বারস্থ হল আর্চবিশপ মহোদয়ের নিকট। সংস্কৃতিবান খ্রীষ্টভক্ত হিতৈষী আর্চবিশপ গাঙ্গুলী শুধু আশ্বাসই দিলেন না খুজতে লাগলেন দাতা। অবশেষে খুজে বের করলেন জার্মানীর দাতা সংস্থা মিজোরী (Messoreor) কে। দাতা সংস্থা পুরো অর্থ দিতে রাজি হলেন কিন্তু শর্ত জুড়ে দিলেন যে তারা জায়গার জন্য কোন আর্থিক সহায়তা দিবেন না। আর্চবিশপ মহোদয় অনেক ভেবে চিন্তে লক্ষীবাজার প্রতিবেশী অফিসের খালি জায়গা থেকে কিছু অংশ খ্রীষ্টভক্তদের কম্যুনিটি সে ন্টারের জন্যে দেবার সিদ্ধান্ত দিলেন। লক্ষীবাজার প্যারিস কাউন্সিলের সেক্রেটারী মিঃ মন্টু ম্যাথিয়াস লিখেছিলেন কম্যুনিটি সেন্টারের Project Proposal. প্রস্তবনায় চার তলা বিল্ডিংয়ের নীচের তলায় মিলানায়তন, দোতলায় ঢাকা ক্রেডিট, সুহৃদ সংঘ, মহিলা সংঘের অফিস এবং বয়স্কদের জন্যে Parish Recreation Club ও সবার জন্য লাইব্রেরী, তিন তলায় Christian Communication Centre, চারতলায় চাকুরীজীবি Geographical Bachelor ও ছাত্রদের জন্যে Dormitory এর প্রস্তাব করা হয়। খ্রীষ্টিয় যোগাযোগ কেন্দ্র বা Christian Communication Centre এ প্রবেশের জন্যে প্রতিবেশী পত্রিকা অফিস থেকে সরাসরি সিড়ি তৈরির ব্যবস্থাও রাখা হয় প্রস্তবনায়। সেন্টারটি নির্মাণের শেষ পর্যায়ে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী মারা যান। সাথে সাথে মন্ডলীর প্রশাসন এবার জমির মূল্য দাবী করে দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত অর্থ চালান আটকিয়ে রাখলো। অনেক দিন নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকার পরে লক্ষীবাজার প্যারিস কাউন্সিল কিছু অর্থসহ ৪র্থ তলা পুরোপুরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ল। এর ফলে অর্থের অভাবে মূল পরিকল্পনা থেকে বাদ পরলো চাকুরীজীবি যুবক ও ছাত্রদের জন্য Dormitory, লাইব্রেরীর আসবাবপত্র, বই ক্রয়, বিদ্যুত হলো মিলনায়তনে সাউন্ড সিস্টেম ও লাইট সংযোজন এবং পুরো মিলানাতন সাউন্ড প্রফ করা। নিমার্ণ কাজ শেষ হলে প্রয়াত আর্চবিশপকে শ্রদ্ধা জানাতে খ্রষ্টভক্তরা মিলনায়তনের নামকরন করে আর্চবিশপ টি,এ, গাঙ্গুলী মিলনায়াতন। তেজগাঁয়ের কম্যুনিটি সেন্টারের নির্মাণ ব্যায়ের অর্থ যোগান-দাতা এবং জমির ব্যবস্থাও করেন আর্চবিশপ টি, এ, গাঙ্গুলী সিএসসি।

আমার শ্রদ্ধাঞ্জলী আমাদের বাংলাদেশ কাথলিক মন্ডলীর বিভিন্ন বড় বড় কর্মকান্ডের পরিকল্পনার রুপকার ও তার বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেবার জন্যে তো বটেই ---- সাধারন খ্রীষ্টভক্তদের সুখ-দুঃখের সাথে একাত্মতা প্রকাশসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে খ্রীষ্টান ছাত্র-ছাত্রী, খ্রীষ্টান যুব সম্প্রদায় ও সাধারন খ্রীষ্টভক্তসহ সবার প্রগতিশীল চিন্তাচেতনায় সহানুভুতিশীল সর্ম্পক, সহায়ক মনোভাব এবং সহায়ক ভুমিকা পালনের জন্যেও। জ্ঞানতাপস আর্চবিশপ টি,এ, গাঙ্গুলী সিএসসিকে 'ঈশ্বরের সেবক' ঘোষনার শুভক্ষণে আজকে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতায় মেতে উঠলে চলবে না বরং সাধুপুরুষ এ ধর্মাধ্যক্ষের মন মানুসিকতা, চিন্তা- চেতনা-ভাবনা, ধ্যান-ধারনা ও কর্মপ্রণালীকে যথাযথভাবে মুল্যায়ন ও অনুধাবন করে আমাদের সবাইকে নির্ধারন করতে হবে আমাদের পরবর্তী কর্মকৌশল। নবনিযুক্ত আর্চবিশপ থেকে শুরু করে সকল ধর্মব্রতধারি- ধারিনীসহ সকল খ্রীষ্টভক্তদের মনে ও হৃদয়ে অঙ্কুরিক হয়ে জেগে উঠুক আমাদের সবার প্রিয় পরলোকগত আর্চবিশপ টি, এ, গাঙ্গুলী সিএসসি'র সে চিন্তা ও চেতনা।

সবশেষে অনেক শ্রদ্ধা জানাই প্রিয় আর্চবিশপকে। আমরা কখনো ভুলবনা আমাদের প্রিয় মানুষটিকে --- শুধুমাত্র প্রথম বাঙ্গালী আর্চবিশপ হ'বার কারনেই নয় বরং ছাত্রযুব তথা খ্রীষ্টভক্ত সুহৃদ সাধু পুরুষ পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ টি,এ, গাঙ্গুলীকে। সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ, খ্রীষ্টভক্তদের জন্যে সবকিছু করার আকাঙ্খা, তার ত্যাগী ভাবমুর্তি নিয়ে ---- অনুকরণীয় আর্দশ হয়েই থাকবেন পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ, সকল খ্রীষ্টভক্তের হৃদয়ে এটাকেই খ্রীষ্টভক্তদের উচ্চারিত প্রথম ও শেষ তথ্য বলে গ্রহন করবেন।

একটি সুহৃদ প্রামাণ্য চিত্র
প্রেক্ষাপটঃ অন্তিম শয়নে আর্চবিশপ টি,এ, গাঙ্গুলী

ডাঃ নেভেল ডিঃ রোজারিও, *ঢাকা, বাংলাদেশ*

প্রথম বাঙ্গালী আর্চবিশপ টি,এ, গাঙ্গুলী সিএসসিকে পূণ্য পিতা পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট এ বছর ঈশ্বরের সেবক হিসাবে ঘোষনা করেছেন। ইতিহাসে কোন বাঙ্গালীকে ধন্যশ্রেণী ভূক্ত করনের প্রাথামিক ধাপ হিসেবে পদক্ষেপের এটাই প্রথম । আজ থেকে ২৯ বছর আগে আকস্বিক হৃদ ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান বাংলাদেশ মন্ডলীর প্রাণপুরুষ আর্চবিশপ টি,এ, গাঙ্গুলী সিএসসি। প্রিয় ব্যক্তিত্বের ইহলোক থেকে আকস্মিক বিদায় সেদিন হতবিহ্বল হয়ে বাংলাদেশের ভাবমন্ডলী মান্ডলিক অভিভাবক ও প্রগতি শূন্যতায় ভারাক্রন্ত হয়ে পড়েছিল। কেননা প্রয়াত আর্চবিশপ টি,এ, গাঙ্গুলী জাতি, সম্প্রদায় ও মন্তলীর সবার প্রগতি ও মঙ্গল কামনায় জীবনভর সাধনা করে গেছেন। তাঁর সাধনার ফল্গুধারায় আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মান্ডলিক জীবন আজ ফলে ফুলে বিকশিত।

তাঁর তিরোধানের পর থেকেই লাখো লাখো অগণিত ভক্ত ও শুভানুধ্যাযীর হৃদয়ের ভালবাসার সিক্ত হয়ে স্বাভাবিক কারণেই সেদিন ভিড় কলেছিল রমনা গির্জায়। সেখানে অনুষ্ঠিত তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় হিন্দু, মসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ধর্মনির্বিশেষে শোকে মুহ্যমান লাখো মানুষের নেমেছিল ঢল। ইতিহাসের পাতায় যে সব বিরল ব্যক্তিত্ব তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টায় বাংলাদেশের খ্রীষ্টভক্ত এবং জনগনের কাছে অমর হয়ে আছেন যুগ থেকে যুগান্তরে প্রজম্ম থেকে প্রজম্মান্তরে, আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

সুহৃদ সংঘ নিছক একটা ক্লাব, সংঘ বা সমিতি বলতে যা বুঝায় আদতে সৃহৃদ সংঘ তা ছিল না বরং এ ছিল একটি আন্দোলন। এ আন্দোলন ছিল শেকড়ের অন্বেষণের পাশাপাশি খ্রীষ্টান সমাজে প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে স্বোচ্চার প্রতিবাদী কণ্ঠ এবং সমাজে বহমান বিপরীতমুখী স্রোতধারার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তা পাল্টনো একটি সমবেত সাহসী পদক্ষেপ। আর এ পদক্ষেপের প্রাথমিক ধাপ হিসাবে সংঘ গ্রহন করেছিল কিছু ব্যতিক্রমধসী সংস্কৃতিক কর্মসুচী ---- এগুলোতেই যে কোন বাধা আসতো তা উত্তরণে সব সময়ই ইতি বাচক ভুমিকা ছিল আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর। আর্চবিশপ গাঙ্গুলী বিশ্বাস করতেন যে সাধারন মানুষের সক্ষমতা এবং মানবিক অর্জনগুলো সাংস্কৃতিক ভাবনায় যুক্ত করতে হবে। আমাদের সম্প্রদায়ে প্রচলিত প্রাচীন বদ্ধমুল চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা, প্রবৃত্তি দিয়ে এ পরিবর্তনশীল বিশ্বকে বোঝা যে কোন ভাবেই সহজ কাজ নয় তা ঠিকই তিনি অনুভব করেছিলেন। আর এটা মনে প্রানে বিশ্বাস করেতেন বলেই সবাইকে সংস্কৃতিমনা হতে উৎসাহিত করতেন সব সময় তাইতো সুহৃদ বাহিনী সেদিন প্রিয়জন হারানোর বেদনা নিয়ে সদলবলে উপস্থিত হ'ল কাকরাইল আর্চবিশপ হাউজ প্রঙ্গণে। আমি তখন ঢাকা মেডিকেলে ইন্টার্নী করছি। খবর পেয়ে ছুটে গেলাম আর্চবিশপ হাউজে। ফাঃ বেঞ্জামিন কস্তা, ফাঃ জ্যোতি গমেজসহ অনেকের সাথে আলাপ শেষে মৃতদেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে বললেন। তখনকার দিনে আজকের মত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৃতদেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিলা না। তখনকার দিনের ব্যবস্থা মত ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন (পোষ্ট মোর্টেম) বিভাগের রবি ডোমের সাহায্যে রগের ভেতরে সিরিঞ্চ দিয়ে সুঠামদেহী মাঝারী আকারের হালকা পাতলা গড়নের আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর মৃতদেহে ফরমালিন প্রবেশ করানো হলো। আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর মৃতদেহ প্রার্থনারত ধর্মব্রতধারী-ধারিনী সিষ্টার, ফাদার, ব্রাদার সেমিরারীয়ান ও সাধারন খ্রীষ্টভক্ত পরিবেষ্ঠিক অবস্থায় রমনা ক্যাথিড্রাল গীর্জার ভেতরে রাখা ছিল। সৃহৃদ পানের দল অন্যান্যের সাথে প্রার্থনার মাঝে মাঝে ধর্মীয় গান পরিবেশন করলো।

মূল অন্ত্যেস্টিক্রিয়ার ও সহার্পিত খ্রীষ্টযাগে বাংলাদেশের তিন বিশপসহ অংশ নেন শতাধিক পুরোহিত। সৃহৃদ গানের দল বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক সুহৃদ দীপক বোসের নেতৃত্বে গানের দলের সাথে খ্রীষ্টযাগের গান পরিবেশন করে। বাংলাদেশে তখন বাংলাদেশ টেলিভিশন ছাড়া আর কোন সরকারী বা বেসরকারী টেলিভিশন ছিল না। ছিল না আজকের মত কোন ক্যাবল টিভি। সরকারী টেলিভিশন চ্যানেল বাংলাদেশ টেলিভিশনেরও কোন ভ্রাম্যমান ক্যামেরা ক্রু ছিলা না, তাদেরকে সংবাদ চিত্রের জন্য নির্ভর করতে হত সরকারী প্রেস এন্ড পাবলিকেশনের ১৬ মিঃমিঃ ক্যামেরায় ধারনকৃত ফিল্মের উপর। ব্যক্তি মালিকানাধীন ভিডিও ক্যামেরা কারো কাছে ছিল না, পাওয়া যেত না আজকের মত অর্থের বিনিময় পেশাধারী কোন ভিডিওগ্রাফার। বাংলাদেশ টেলিভিশনের সংবাদে পরিবেশনার জন্যে সেদিনের সে অন্তেষ্টিক্রিয়ার চিত্রধারনের জন্যে সরকারী প্রেস এন্ড পাবলিকেশনের একজন ক্যামেরাম্যান ১৬ মিঃ মিঃ ক্যামেরা নিয়ে আসেন। ক্যামেরাম্যান যখন চিত্রধারন করছিলেন তখনই সর্বসুহৃদ হিউবার্ট অরুণ রোজারিও, সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব সুহৃদ জর্জ ডিঃ রোজারিও, সুহৃদ পাস্কেল গমেজ, সুহৃদ ক্লিফোর্ড চন্দন গমেজ, কোর দি জুট ওর্যাক্সের প্রক্তন ডিরেক্টর ও বিশিষ্ট সমবায়ী ব্যাক্তিত্ব সুহৃদ সুভাস সেলেষ্টিন রোজারিও, কোর দি জুট ওর্যাক্সের বর্তমান ডিরেক্টর সুহৃদ মাইকেল বকুল গমেজ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব সুহৃদ পিযুস দলীপ কস্তা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষক সুহৃদ ডাঃ ডনাল্ড গমেজ ও বর্তমান লেখক সুহৃদ ডাঃ নেভেল ডিঃ রোজারিও তড়িৎ সিদ্ধান্ত নেয় অনুষ্ঠানের উপরে একটি প্রামান্য চিত্র নিমাণের। সিদ্ধান্তনুযায়ী এক ফাকে ক্যামেরাম্যানকে একটু বেশী করে অনুষ্ঠানের চিত্রধারনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। ক্যামেরাম্যান তিন মিনিটের আন্দাজের চিত্রধারণের জন্য বরাদ্দকৃত ১৬ মিঃ মিঃ ফিল্মের সীমাবদ্ধতার কথা জানালে অতিরিক্ত ফিল্মের ব্যয়ভার সুহৃদ সংঘ বহন করবে বলে জানানো হলে উনি ১০ মিনিটের আন্দাজের চিত্রধারণে রাজী হ'ন। আলোচনায় স্থির করা হয় যে উনি সন্ধ্যার মধ্যে ধারনকৃত ফিল্মের অংশ এডিড করে ষুচনা টেক্সের লিখা ফিল্মটি আমাদেরকে হস্তান্তর করবেন বিনিময়ে ফিল্মসহ সর্বসাকুল্যের ব্যয় বাবদ তাকে দেয়া হবে ৫০০/= টাকা। সর্বসুহৃদ জর্জ ডিঃ রোজারিও ও পাস্কেল গমেজের তত্ত্বাবধানে ক্যামেরাম্যান পুরো অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ন অংশের চিত্রধারন করেন এবং তাঁরাই সন্ধ্যায় কাকরাইলস্থ নির্দিষ্ট স্থান থেকে তা গ্রহন করেন। এ ভাবেই নির্মিত হ'ল একটি সুহৃদ প্রযোজনা হিসেবে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর উপরে নির্মিত একমাত্র প্রাম্যণ্য চিত্র "অন্তিম শয়নে আর্চবিশপ টি,এ, গাঙ্গুলী"।

নির্মাণের পর থেকেই সুহৃদ সংঘ যখনই যেখানেই সুযোগ পেয়েছে ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। নিজেদের এবং খ্রীষ্টান ছাত্রকল্যাণ সংঘের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও প্রামাণ্য চিত্রটি প্রদর্শিত হয়েছে বেশ কয়েকবার। নির্মাণের পর থেকেই যথাযথ সংরক্ষণের জন্যে সুহৃদ সংঘ বার বার যোগাযোগ করেছিল খ্রীষ্টান যোগাযোগ কেন্দ্র 'বাণীদীপ্তি' র সাথে ---- কোন প্রকার শর্তবিহীন ভাবে প্রামাণ্য চিত্রটি হস্তান্তরের জন্যে। 'বাণীদীপ্তি' কতৃপক্ষের এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ না দেখানোতে এ হস্তান্তর করা হয়ে উঠেনি। 'বাণীদীপ্তি' র নিজস্ব কোন প্রযোজনা না হওয়ার কারণেই সম্ভবতঃ এ অনাগ্রহতা। জানিনা অযত্নে-অবহেলায় হারিয়ে গেছে কিনা আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর উপর নির্মিত একমাত্র প্রামাণ্য চিত্রটি। এ কথাটা আরও বেশী করে অনুভুত হয়েছে যখন আর্চবিশপ জীবনী নিয়ে তৈরি করা মাল্টিমিডিয়ায় শব্দ বিম্বিত পরিবেশনাটাকে স্থির চিত্রের স্-াইড শোতে পরিণত হওয়া দেখে।

সর্বশেষে অনেক অনেক শ্রদ্ধা জানাই প্রিয় আর্চবিশপকে। সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ, খ্রীষ্টভক্তদের জন্যে কিছু করার আকাঙ্খা, তাঁর ত্যাগী ভাবমুর্তি নিয়ে ---- অনুকরণীয় আদর্শ হয়েই থাকবেন পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ, সকল খ্রীষ্টভক্তের হৃদয়ে এটাকেই খ্রীষ্টভক্তদের উচ্চারিত প্রথম ও শেষ তথ্য বলে গ্রহণ করবেন।

লেখা আহ্বান

"তেপান্তরী" তে ছাপানোর জন্য আপনার লেখা গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ছড়া, উপন্যাস আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

PBCA P.O. Box 1258, NewYork NY 10159

প্রবাসীর তথ্য পেতে ভিজিট করুন

www.PBCAusa.org

REMEMBERING THE SERVANT OF GOD THEOTONIUS AMAL GANGULY, C.S.C.

Hubert Arun Rozario, Woodbridge, VA

Remembering Archbishop T.A. Ganguly of Dhaka is a venerable affair, because he is on the path of beatification and canonization. My best impression of His Grace Ganguly in my student days is whenever I met him he never lectured me to be holy or a better Christian, he never tried to make me a better Catholic, but there was clearly a special presence about him in goodness and what he did best was to listen to me with patience and loving care. Archbishop Ganguly came into our lives as a Gift of God, to show us the way to imitate Christ and bear the witness of Christ in our different and unique circumstances of our ordinary lives.

Archbishop Theotonius Ganguly had his unique way of transforming power of Christian love in a very poor country full of political chaos and heat of our battle for Independence. To most of us Archbishop Ganguly is consistently remembered as a quiet man of gentle presence and few words. As the first Bangali Christian Ph.D. he could talk to us on theology and philosophy all day long but he never did that accept whenever he was teaching his class at the Notre Dame College. But his example in life and actions spoke for themselves.

I remember Archbishop Ganguly in the days of war, when he was trying frantically to passage letters and money from the Bangali workers in West Pakistan to their families in our remote villages, to sustain their livelihood and help their children to continue studies in the village schools, at the risk of his life, he wanted to give us protection and consolation in our country where death was everywhere. He did the miracle and a new channel was opened to communicate between their families and workers in Pakistan and send money via London. I was with him helping in small way and reminding him each day not to take this risk as the GPO would ultimately find out and he would be picked-up by the Pak soldiers, he just remained silent, and I knew his silence was speaking to me loud and clear, in his second floor office. As the Mukti Juddha escalated conflicts throughout our country Archbishop Ganguly's prudent actions and holiness continued to shine as a beacon of light and hope to all Bangalees.

I left for Melaghar Mukti Bahini camp in Agartola in the month of May and before that I saw Archbishop Ganguly, he just asked me "do you realize that you are taking a most dangerous path?" I did keep quiet, and then he slowly said that it is also the most effective and glorious path to liberate our occupied country. He then put his hand on my head and just said "God is with you wherever you are posted." With that selfemptying love of Christ he bade me farewell. I felt the presence of Christ in me, while walking out of the Archbishop's House.

I had the privilege to work for the formation of "Trebeni Chatra Kalyan Shanga," "Shurid Shanga" and the "Chatra Kalyan Shanga," many a times I was overburdened with problems to organize our youth, I came to him, told about our shortcomings and difficult problems, Archbishop Ganguly put himself under our burdens, he didn't have to do that but he wanted to. The fact is he always wanted to be with us in the field in the difficult situations when nobody came forward to help the Bangali Christian youth.

Archbishop Ganguly worked hard during the liberation war in extreme conditions, he traveled from parish to parish and spoke of hope and love, and his homilies were simple and direct. He did not care for his comfort in order to share in the sufferings of Bangalees in the hands of Pakistani soldiers. Till his death, he was always willing to take on our burdens, to share on our sufferings and anxieties.

Whenever I heard him speak, I had a feeling of peace, if I was worried and anxious, he took my fears and burdens, and in return he gave me the comfort of sacraments. We were so honored to have Archbishop Theotonius Amal Ganguly as the head of our Mondoli in Bangladesh and to have him around us, for that, we are forever grateful to God. I am convinced that I was allowed to live to bear witness to this holy man. He was indeed "God's go-between."

লেখা আহ্বান

"তেপান্তরী" তে ছাপানোর জন্য আপনার লেখা গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ছড়া, উপন্যাস আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

PBCA P.O. Box 1258, NewYork NY 10159

প্রবাসীর তথ্য পেতে ভিজিট করুন

www.PBCAusa.org

দু'টি গল্প
বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে

নিকোলাস এস. অধিকারী, *ক্যালিফোর্নিয়া*

একঃ
বিশ্বস্ততা ও প্রেমের সাক্ষ্য-দেয়া এক "খুশীর গল্প"

এক লোক তার ধর্মযাজকের কাছে গিয়ে বলল, "গুরু, আমাদের বিবাহিত জীবনের দশ বছরের মধ্যে আমাদের সংসারে কোন সন্তান আনে নি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি আমার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চাই। আপনি অনুমতি দিন।"

বিজ্ঞ গুরু জানতেন। তার এই শিষ্য একটু ভিন্ন ধরনের। আবেগ-প্রবনতা তার মধ্যে বেশী কাজ করে। বললেন, "ঠিক আছে, তাই কর। কিন্তু একটা কথা মনে রাখ। দশ বছর আগে তোমাদের বিয়ের অনুষ্ঠান খুব জাঁক-জমকের সাথে করেছিলে। স্ত্রী-ছাড়ার অনুষ্ঠান যেন তেমনভাবে হয়।

গুরুকে খুশী করতে শিষ্য বেশ তোড়-জোড় করেই ব্যবস্থা করল। খাওয়া-দাওয়া প্রচুর। সাথে সুরা পান। আমেজে তার মনটা খুশীতে টই-টুম্বুর। স্ত্রীকে ডেকে বলল, "তোমার ওপর আমি ভীষন খুশী। টাকা-পয়সা ভবিষ্যতে তোমার যা লাগবে, তা ত' দিয়েছি তোমাকে। এবার বাপের বাড়ী ফিরে যাওয়ার সময়ে তোমার খুশী মতো সবচে দামী জিনিষটাই নিয়ে যেতে পার। আমি কোন আপত্তি করবো না। বাকী জীবনটা তোমার দীর্ঘতর হোক। সুখের হোক।"

পরদিন ভোরে লোকটার ঘুম ভাঙ্গে নতুন এক জায়গায়। অবাক হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। স্ত্রীকে আসতে দেখে বললো, "ব্যাপারটা কি বুঝিয়ে বলতো।" স্ত্রী ধীরে সুস্থে বললো, "আমি কেবলমাত্র তোমার কথামতই কাজ করেছি। গতরাতে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে চাকরদের বললাম খাট-বিছানায় তোমাকে তুলে নিয়ে আমার বাপের বাড়ী রেখে যেতে। গতকাল তুমি আমাকে সবচে' দামী সম্পদ দান করেছো। তুমিই আমার কাছে মহামূল্যবান সম্পদ।"

লোকটা কতক্ষন হা করে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলো। কিছুক্ষন পরে তার টনক নড়ে উঠলো। সে তক্ষুনি তার স্ত্রীর আন্তরিক ভালোবাসার ছোঁয়াও অনুভব করলো। পরদিন গুরুর কাছে গিয়ে শিষ্য বললো, "গুরু, আমিও আমার স্ত্রী আবার মিলেমিশে আছি। আমরা আপনার প্রার্থনা ও শুভেচ্ছা চাই। আমাদের ঘরে এক সন্তান এস যেন আমাদের উত্তরাধিকার রক্ষা করে।"

গুরু বললেন, "তথাস্তু। তোমার একথা বলার আগেই তোমাদের জন্য আমার কল্যাণ কামনা স্রষ্টার কাছে পৌঁছে গেছে।"

যথাসময়ে তাদের ঘর আলো করে এলো এক ফুটফুটে সন্তান।

স্বামী-স্ত্রী খুশী। গুরুজী খুশী। স্রষ্টাও খুশী।

দুইঃ আশীর্বাদ ও অভিশাপ

(ইতালী দেশের প্রাচীন লোকজ-কাহিনী অনুসারে জানা যায় যীশু খ্রীষ্ট কখনো কোন শিষ্যকে নিয়ে ইউরোপ ও আফ্রিকা ভ্রমনে যেতেন। এ কাহিনীতে মিশে আছে মানুষের সেবায় এক নরম ও এক কঠিন মন)

এক পড়ন্ত সূর্যের বেলাতে গুরু প্রভু যীশু তাঁর প্রধান শিষ্য পিতরকে নিয়ে এক ধনীর দুয়ারে গিয়ে হাজির। গুরু ঘরের কর্তাকে ডেকে বললেন, "আমাদের দুজনার ক্লান্ত শরীরকে একটু বিশ্রাম দিতে আপনাদের এখানে একটু জায়গা হবে কি?"

স্বামীর পাশে দাঁড়ানো স্ত্রী ফস্ করে হাঁক পাড়লেন, "আমাদের দেখে সরাইখানার মালিক বলে আপনার মনে হচ্ছে কি?" কথাটা এমন যেন গরম কড়ায় খৈ ফুটছে।

আর কিছু না বলে গুরু-শিষ্য রাস্তার ওপারে গিয়ে এক মধ্যবিত্তের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। করাঘাত করতেই এক মহিলা এসে দরজা খুলে দাঁড়ালেন। মার্জিত সৌম্য ভাব চোখে মুখে। কোলে এক শিশু। গুরুজীর সেই একই প্রশ্ন। জায়গা হবে কি-না।

মহিলা আন্তরিকতার সাথে বললেন, "কিছুটা জায়গা আপনাদের জন্য ছেড়ে দিতে আমরা সানন্দে রাজী আছি। আপনাদের নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। হাত-পা ধুয়ে আগুনের কাছে গিয়ে শরীরটা গরম করে নিন। বাচ্চাদের শুইয়ে দিয়ে, আপনাদের জন্য খাবার নিয়ে আসছি।"

তারা ঘরে ঢুকে দেখলেন আরো দুটে ছেলেমেয়ে। মহিলা সবাইকে নিয়ে শোয়ার ঘরে গেলেন। একসাথে প্রার্থনা করলেন। ওদের শুইয়ে রেখে অল্প সময় পরেই অতিথি দুজনের জন্য খাবার নিয়ে এলেন। মনে হলো আজ যেন রান্নাটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল।

পরদিন ভোরে গুরু-শিষ্য ঘুম থেকে উঠে দেখলেন টেবিলের ওপর গরম নাস্তা রাখা আছে। মহিলা বললেন, "নাস্তা খান। আমার মনে হয় রাতে আপনাদের মোটামুটি বিশ্রাম হয়েছে।"

ওরা নাস্তা খাচ্ছেন। তাকিয়ে দেখেন, বাচ্চাদের স্কুলের জন্য সব গুছিয়ে মহিলা ওদের স্কুলে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। একটা ব্যাগ শিষ্য পিতরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "এর মধ্যে কিছু খাবার আছে। আমার মনে হয় সরাইখানার তেল-ঝাল-মশলায়-রান্না খাবারের চাইতে এ-খাবার মোটামুটি ভাল হবে।"

গুরু মহিলাকে বললেন, "আপনার আদর-যত্নে আমরা খুশী। আমি যীশু। ইনি হচ্ছেন পিতর। আপনি আজ সকালে এখন যে কাজ শুরু করবেন, সারাদিন সে কাজই সুন্দরভাবে করতে পারবেন। পরদিনও তাই। এভাবে এক মাস বিদায় জানিয়ে তাঁরা পথে পা বাড়ালেন।

বাচ্চারা স্কুলে গেছে। দুপুরের রান্না-বান্নাও শেষ। মহিলা তাঁতে কাপড় বুনতে শুরু করলেন। তাঁত চলছে ত' চলছে। আর একের পর এক সুন্দর সুন্দর কাপড় বার হচ্ছে। কী সুন্দর রঙ আর ডিজাইন। এতো সুন্দরভাবে কখনো তার তাঁত চলেনি। বাচ্চারা স্কুল থেকে যখন এলো, তখন তার কাপড় রাখার তাকিয়াগুলো পূর্ণ হয়ে গেছে। সন্ধ্যায় রাতের খাবার খেয়ে মহিলা আবার তাঁতে বসলেন। গভীর রাতে যখন তাঁত ছেড়ে উঠলেন, তখন ঘর ভরতি শুধু কাপড়। রাতে গভীর নিদ্রায় বিশ্রাম নিয়ে ফুরফুরে শরীরে ঘুম থেকে উঠলেন।

ঠিক এমনি সময়ে প্রতিবেশী ধনী মহিলা এসে হাজির। কাপড়ের পাহাড় দেখে তাজ্জব হয়ে গেলেন। দু' চোখ যেন ছানা-বড়া! আর্শীবাদপ্রাপ্ত মহিলা প্রতিবেশিনীকে ঘটনা খুলে বললেন।

প্রতিবেশিণীর দু' চোখ দুটো লোভে জ্বল জ্বল করছে। বললেন, "ওরা কি আবার এদিকে আসছেন?"

ওদের কথায় বুঝলাম, সপ্তাখানেকের মধ্যে এদিকে আবার আসবেন।

ওরা এলে আমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিও, বোন। আমিও যেন ওদের আশীর্বাদ পাই।

আচ্ছা তাই হবে।

কয়েকদিন পর গুরু-শিষ্য ফিরে এসে পুরোন গৃহকত্রীর বাড়ীতে এসে উঠলেন।

মহিলা বললেন, "আমার প্রতিবেশিনীর ঘরটা আরো খোলামেলা। আর আপনারা গেলে উনি খুশী হবেন।"

রাস্তার ওপারে যেতে যেতে সাধু পিতর বললেন, "এই ধনী মহিলা আমাদের পছন্দ করেন না। আর মনে হচ্ছে উনি এখন আমাদের আশীর্বাদটা চাচ্ছেন।"

গুরু বললেন, "এমন কিছু লোক আছে যারা লোভের বশে আশীর্বাদকে একটু ভূল করে অভিশাপের দিকে ঠেলে দেয়।"

গুরু-শিষ্য রীতিমত সকালে নাস্তা খাচ্ছেন। প্রতিবেশিনী মহিলাকে বললেন, "আজ সকালে এখন থেকে যে কাজ শুরু করবেন সারাদিন সে কাজই সুন্দরভাবে করতে পারবেন।" কথার শেষে গুরু-শিষ্যের মধ্রে চোখের চাউনী বিনিময় হলো।

ওরা চলে যেতেই স্বামী তাঁত ঠিক-ঠাক করে দিলেন। স্ত্রী যেন নিশ্চিন্তে তাঁত বুনতে শুরু করতে পারেন।

স্ত্রী তাঁতে বসার আগে ভাবলেন- যাই, টয়লেটে গিয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার কাজটা সেরে আসি। কাজের মধ্যে বারে বারে উঠে সময় নষ্ট না হয়।

মহিলা ঐ কাজ শেষ করে তাঁতে বসতে যাবেন। ঠিক তখনই আবার প্রকৃতির ডাক। ফিরে এলে আবার! আবার! ঘুমাতে যাবার আগ পর্যন্ত ঐ একই ডাকের সাড়া দিতে যেতে হচ্ছে। হায় ঈশ্বর!!

ভাগ্যিস গুরু আশীর্বাদ দেবার শেষে 'পরদিনও তাই' শব্দগুলো যোগ করেন নি! মহিলার ভাগ্য ভালো বলতে হবে।

আমি ক্ষমা চাই

আন্তনী বিমল গমেজ, *ওজন পার্ক, নিউইয়র্ক*

যখন ছোট ছিলাম মাকে বলতে শুনেছি। "গ্রামে আমরা সবাই সবার আপন।"

কিন্তু কি মনে হয় জানেন? এটা যেন ছিল একান্তই মায়ের স্বপ্নের গ্রাম। দুঃখের হলেও সত্যি যে তার এই মানষ গ্রাম কোন কোন ক্ষেত্রে আদৌ বাস্তবে পরিনত হয়নি। যদি হোত তবে কি এমনটি ঘটতে পারতো?

সে যাই হউক, গ্রামে তোমাদের মাঝে জন্ম নিয়ে ধিরে ধিরে বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের শিক্ষা অনুসারে শিশু বয়স থেকেই সবাইকে আপন ভেবে যথার্থ সন্মান ও ভালবাসা দিতে শিখলাম। বড়দের অনেককে দাদা, কাকা, জ্যাঠা ইত্যাদি বলে আবার কাউকে বা মাসিমা, কাকিমা, বৌদি ইত্যাদি বলে ডাকতাম।

তোমাদের প্রচুর ভালবাসা ও প্রভাবে শৈশব ও কৈশর পেড়িয়ে গ্রামের স্কুল শেষে উচ্চতর শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে শহরে চলে যাই। সেখানে নতুন পরিবেশে, নতুনত্বের নির্মম আকর্ষনে নিজের অতীতকে বিষর্জন দিয়ে ভুলে যাই তোমাদেরকে। এরপর সেখানেই আমার কঠিন কর্মজীবন ও সুখ শান্তি সন্ধানে দীর্ঘ যাত্রা শুরু হয়।

শান্তির অন্বেষনে অশান্ত মন শান্তি পেলনা কোথাও। তাইত বারবার ফিরে আসে তোমাদের মাঝে হারিয়ে যাওয়া দিনগুলিতে তোমারদেরই সাথে আবার শান্তি তে বেঁচে থাকতে চায়। একা একা গ্রামের পথে ঘাটে, বাড়িতে বাড়িতে হেটে চলে আর নিরবে তোমাদেরকে ডাকে - দাদা, কাকা, মাসিমা, বৌদি তোমরা কোথায়? নিঃশ্বব্দ। কোন সাড়া নেই, জবাব নেই কোন। তবে কি তোমরা বেঁচে নেই। জানি না কখন চলে গেছে।

হ্যাঁ মাসিমা, তুমি ও বীনা বৌদি অনেক আগেই তো গ্রাম ছেড়ে দিলে। কোথায় গেলে, কেন গেলে কখনও জানতে চাইনি। তোমার মনে আছে নিঃশ্চই যে প্রায় ত্রিশ বছর পরে এবং ষোল বছর আগে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়। তোমার নিজ মুখে বলা সব দুঃখের কথাই শুনেছি।

মেসো মশাই কলকাতায় চাকুরী করত। বিয়ের পর আট দশ বছর তোমাদের বেশ ভালই কেটেছে। তারপর মেসোর অসুস্থতার কারনে সংসার চালানর জন্য একটি পয়সাও আর দিতে পারে নাই। প্রচন্ড দারিদ্রের সম্মুখীন হয়ে সাহায্যর আশায় দ্বারে দ্বারে ঘুরেছ। নিজের অসহাতায় কথা গীর্জায় পুরোহীতকে বলেছ। ঢাকার এক খ্রীষ্টান প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে কষ্টের কথা বলে ছোট এক চাকুরীর জন্য অনুময় বিনয় করেছে। কোথাও মেলেনি তেমন কিছু। দারিদ্রের নিষ্ঠুর নিপিরনের অতিষ্ট হয়ে জীবনের কঠিনতম সিদ্ধান্ত নিলে। বুকের ধন শিশুটিকে সিস্টারদের হাতে তুলে দিয়ে ঢাকার এক সাহেবের বাড়ীতে ছোট এক কাজ নিলে। শেষে প্রলোভিত হয়ে এবং নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে একই বাড়ীতে ভিন্ন ধর্মলম্বী এক কর্মীকে বিয়ে করে তার সংসার করছ। জীবন সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত হেরে গেলে মাসিমা। স্বীয় স্বত্বাকে হারিয়ে মানুষ বড় আর কি পেতে পারে জানিনা।

বৌদি, মাসিমার মত আনেকটা একই কারনে তোমাকেও আমরা হারিয়েছি। তবে তোমার জীবন ইতিহাস অনেক, অনেক বেশী মর্মভেদী। দাদার অকাল মৃত্যু, চারটি সন্তানের অসহায় পরিবারকে অভাবের সাগরে ভাসিয়ে দেয়। শুরু করলে তোমার নিজের ও শিশু চারটির জন্য অন্ন সংগ্রহের অসহনীয় সংগ্রাম। গ্রামে দুই একটা বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে এবং চেয়ে চেয়ে ভিক্ষা নিয়ে অল্প সময়ই চালাতে পেরেছে। তারপর বেরুলে শহরে চাকরীর খোঁজে। শুরু হয় নিজ জীবন ধ্বংসের পালা। সন্তান চারটির ভাগ্যে বাবার মমতা ও মায়ের স্নেহ বেশী দিন সইল না। একমাত্র ছেলেকে স্কুলে ব্রাদারদের হাতে এবং মেয়ে তিনটিকে স্কুলে সিস্টারদের হাতে সপে দিয়ে স্বামীর ভিটে ত্যাগ করলে।

প্রায় চলি-শ বছরের পূর্বে স্কুলে ওদেরকে রেখে যাবার সময় হয়তবা ওদের চোখে চোখ রেখে অনেক কেঁদেছ, মাথায় হাত বুলিয়ে শেষ আদর দিয়ে সবার গালে শেষ চুমো দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে শেষ বিদায় নিয়েছ। তোমার কান্না নিঃশ্চয়ই ওদেরকেও কাঁদিয়েছে। ওদের সঙ্গে তোমার, ও তোমার সঙ্গে ওদের ওটাই ছিল শেষ দিন।

বৌদি, তোমার ছেলের সঙ্গে তিন চার বৎসর আগে বিদেশে আমার দেখা হয়েছে। জিজ্ঞেস করেছি, "মায়ের কোন পেলে?" চোখের জল ধরে রাখতে পরেনি সে । কাঁদতে কাঁদতে বললে, "কাকা মায়ের অনেক খোঁজ করেছি, এইত,সেদিনও মায়ের খোঁজে ঢাকায় গিয়েছিলাম। কোন খোঁজ খবর পাইনি কাকা। মা এদ্দিন হয়ত আর নেই। কোন দুষ্ট আত্মার কুনজরে পরে হয়ত প্রান দিয়েছে।" বৌদি ওরা তোমার প্রতিক্ষায় পথ চেয়ে আছে।

দুটো বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে এই লেখাটি। আমার প্রিয় গ্রামবাসীদেরকে দোষী করবার চেষ্টা নয়। আমার বিশ্বাস কিছু উদ্দোগী মানুষের চেষ্টা,দিক নির্দেশনা পরিচালনায় গ্রামের মানুষ দরিদ্র, সহায়-সম্বলহীন প্রতিবেশীর সমস্য নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে অভ্যস্ত হবে। ওটাই হবে সমস্যার আসল সমাধান।

আমাদের প্রতিটা গ্রামে শিক্ষিত, শিক্ষিতা ও অর্থশালী মানুষের সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেশী। তাই আপনারা প্রতিটা গ্রামের জ্ঞানীগুনী, শিক্ষিত ও দায়িত্বশীল ব্যাক্তিরা একসঙ্গে বসে কি উপায়ে গ্রামের দুই চারটা দরিদ্র পরিবারকে সাহায্য করে আমার মাসিমা ও বৌদির মত মায়েদের জীবন ও আত্মা রক্ষা করা যায় সে উপায় বের করতে চেষ্টা করুন। এটা আমাদের নৈতিক দাযিত্বও বটে।

যে গ্রামের নামে বিশ্বে আমরা পরিচিত, সে গ্রাম আমাদের চীরকালীন স্থায়ী ঠিকানা, সেই গ্রাম ও গ্রামবাসী আমাদের দ্বারাই সবচেয়ে বেশী অবহেলিত। আমার অকৃতজ্ঞ, সার্থপর জীবনের সংক্ষিপ্ত চিত্রই তার সুস্পষ্ট প্রমান।

আমার সামান্যতম চেষ্টা হয়তবা অনেকের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারত।

আমার নিশ্চেষ্টতা ও অবহেলার জন্য আমি ক্ষমা চাই।

লেখা আহ্বান

"তেপান্তরী" তে ছাপানোর জন্য আপনার লেখা গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ছড়া, উপন্যাস আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

PBCA P.O. Box 1258, NewYork NY 10159

প্রবাসীর তথ্য পেতে ভিজিট করুন

www.PBCAusa.org

আঠারগ্রাম অঞ্চল
প্রাকৃতিক পরিবেশ - পদ্মা - ইছামতি

সুশীল গমেজ, *সিডনী, অষ্ট্রেলিয়া*

আজ এই সুদুর প্রবাসে নিভৃতে নির্জনে স্বর্গপ্রসু আঠারগ্রাম অঞ্চলের সেই দোয়েল-শ্যামা-কোকিলের গান, নদীর কলতান, সমীরনের সাথে সাথে নেচে উঠা ধান্য -পনের হৃদয় মাতানো নৃত্য, কচুরী কলমীলতাও তরুলতা ফুলের নয়ন জুড়ানো নীলাভ রং এর বাহার, কৃষ্ণচূড়া-হিজল-তমাল ও শিমুলের কাল রক্তিম আভা, কুসুদ কুসুদিনীর ও গলংকলার বিস্তির্ন জলাভুমির মনোরম দৃশ্য, ঘরের চালে বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ার মাতন, রিনি-ঝিনি, ঝিরি-ঝিরি সুর, কৃষান-কৃষানীদের হৃদয় মাতানো ভাটিয়ালীর সুর, দুচোখ ভরে আয় একবার দেখার জন্যে মন আজ পাগলপারা। ইছামতির বাঁকে-বাঁকে, বিল-হাওয়ের ফাঁকে-ফাঁকে, লুকায়িত প্রকৃতির শ্যাম-সুন্দর শোভা মনের দোয়ারে উঁকি দিয়ে আজ আবার ৫০/৬০ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া উদাসী মনকে স্বর্ণকেশী মায়ের আঁচলতলে নিয়ে যেতে চায়, আদরে সোহাগে। দুঃখের নদী উত্তীর্ণ হয়ে মন ছুটে যেতে চায় সেখানে, যেখানে আছে শ্যামলে-সবুজে ঘেরা, নদী-নালা, খাল-বিলে ভরা, আমার জন্মভূমি আঠারগ্রাম অঞ্চল। এ অঞ্চলের প্রাকৃতিকদৃশ্য - - নয়নাভিরাম ও উপভোগ্য। এখানেই রয়েছে আমার নারীর টান। গঙ্গা - পদ্মা - কালীগঙ্গা - ধলেশ্বরী ও ইছামতি বাহিত পলিদ্বারা এ অঞ্চল স্বর্ণসবিনী। জলাভূমি-গোচর ভূমির কোন অভাবই পরিলক্ষীত - - এ অঞ্চলে। ষড়ঋতুর প্রত্যক্ষ আনা-গুনা ও পরিবেশ পরিদৃষ্ট হতো আমাদের এ অঞ্চলে। এই পলিভরা নরম মাটির মতো নরম ছিলো এ অঞ্চলের মানুষের সমত্ত। ১৯২৬, ১৯৫৬ এবং ১৯৬৪ সনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার নিরীহ নর-নারী শিশু অকালে প্রান হারিয়েছে। কিন্তু অতীব গর্বের বিষয় এই যে, এর বিষ-বাষ্প আমাদের এ অঞ্চলে এসে সংক্রমিত হতে পারেনি। বরং পরষ্পর পরষ্পরকে সাহায্য - সহযোগীতা করেছে, পরষ্পর পরষ্পরকে সাহস যুগিয়েছে। এখানে হিন্দু-মুসলমান ও খ্রীষ্টানের গানের সুর একত্রে ধনীত হয়ে শান্তনার আশীন ধারার মতো লোকসান করেছে সুলতান।

বর্ষাকালে বানাই-তুফান ও ফাঁপড়ী মেঘের উম্মত্ত উত্তাল-মাতনের সাথে সাথে ক্ষেত-নিড়ানী কৃষানদের পাওয়াঃ

"মধুমালায় মধুমালা তোর প্রেমেরই এতো স্কালাগো
লোকজন আমি স্পপ্নে দেখি মুধুমালার মুখ"।

সুরের মুর্ছনা ভেসে এসে বিরহিনী কৃষানীদের উদাসীমনে জাগিয়ে তুলতো প্রেমের হিলে-ল। তারাও এ-সুরের সাথে সুর মিশিয়ে মনের অজান্তে গেয়ে উঠতো ঃ

"নিশিথে যাইও ফুলবনের বোমড়া
নিশিথে যাইও ফুলবনে"

ইহা রূপকথার মতো শুনালেও ইহাই ছিলো অমোঘ সত্য। যার কিছু কিছু ছোট বেলায় আমরাও প্রত্যক্ষ করেছি, উপভোগ করেছি, ছাড়িয়ে ফেলেছি নিজেদের এ-সুরের মধ্যে। এ-সব স্মৃতি আজ শুধু স্মৃতি হয়েই বেঁচে আছে হৃদয় মাঝে। যাই হোক প্রকৃতির সৌন্দর্য, নাই সেইে পরিবেশ, জুলাভূমি ও গোচায়নভূমি।

পদ্মা-নদী

যার উলাঙ্গ আবার মালীকান্দা ও নগরকান্দা গ্রামদুটি এবং আধার গ্রাম অঞ্চলের সর্ব প্রথম ঐতিহ্যবাহী গীর্জায় "মালীকান্দা" নদীর পদ্মা-কক্ষে বিলীন হয়ে গিয়েছে। কবরস্থানের সামান্য কিছু ধ্বংসবাশেষ অবশিষ্ট থেকে তার স্বাক্ষর বহন করেছে মাত্র। পদ্মা ও মেঘনায় মধ্যবর্তি ভূভাগে ঢাকা হ'তে ২৮ মাইল দক্ষিন-পশ্চিমে অবস্থিত এই মালাকান্দা ও নগরকান্দা গ্রামদুটি। ১৭শ খ্রীষ্টাব্দেও "লড়িকুল" ও "শ্রীপুর নামে পরিচিত ছিল। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে John De Silveyra মালদ্বীপ হ'তে চারখানা বানিজ্য গোত্র নিয়ো প্রথম বঙ্গদেশ প্রবেশ করেন এবং চাঁটগাঁয়ে কুটি স্থাপন করেন। এখানে তাঁরা লবনের ব্যবসা করতেন। মেজর রেনোল ১৮শর প্রথমভাগে লড়িকুলে পর্তুগিজদের নির্মিত এই মালীকান্দা গীর্জাটিকে ধ্বংসপ্রান্ত অবস্থায় পদাপর্ন করেনা (ঢাকায় ইতিহাস ১ম খন্ত যতীন্দ্রমোহন রায়) এ থেকে ধারনা করা যায় যে এই লড়িকল ও শ্রীপুরই মালাকান্দা ও নগরকান্দা গ্রাম। তাহলে আমরা অনুমান করতে পারি যে, ১৫শর মধ্যভাগেই এই গীর্জ স্থাপিত হয়েছিল। কেননা পতুগীজরা ১৫২০ বা ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকেই লড়িকুলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন।

পদ্মা তার ক্রুড়-রূঢ়-রুক্ষ ও আপোষহীন স্বভাবের জন্য, নানা সময়ে নানাভাবে নানা নামে অভিহিত হয়ে সাদর্পে-সম্পর্কে মিলিত হয়েছে সাগর সঙ্গমে। বিধ্বস্থ করেছে অনেক জনপদ-সমতটভুমি, কেড়ে নিয়েছে নিরীহ মানুষের সুখ-সম্পদ, আনন্দ-আল-াদ এবং সুখের হাসি। হাজার মানুষের প্রানকেন্দ্র এই উপাসনালয়কে নিমূম ও নির্লজ্জভাবে গ্রাস করে পদ্মা নামধারন করেছে কলঙ্গিনী। ভাগ্যকুল কুন্তদের ঐতিহ্যবাহিক ও ঐতিহ্যবাহী প্রাসাদবাদী, যে প্রসাদে লর্ড মাউন্ড ব্যাটেনও এসে থেকেছেন, এর ধ্বংস করে মত্তাপদ্মা নাম নিয়েছিলো রাক্ষুসী। রাজা পৃথিরাজের কীর্তি ধ্বংস করে, স্রোত পরিবর্তন করে কীর্তিনাশা নাম ধারন করেছে। এই কীর্তিনাশাই পরবর্তিতে চাঁদরায় ও কেদার রায়ের কীর্তিরাশিসহ রাজধানী শ্রীপুর এবং অনেক গ্রাম গ্রাস করে, পদ্মাগর্ভে বিলীন করে ফেলেছে।

দর্প কখনই চিরস্থায়ী থাকে না। তাই দর্পহারীর অদৃশ্য হাতের আঙ্গলী হেলনে লজ্জাহীন উম্মত্তা-উম্মাদিনী মা তার জীবন সোধন-উচ্ছালতা এমনকি সবকিছু হাড়িয়ে এলোকেশী বেশ ধারন করে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। যার বুকের ওপর খেলা করতো অথৈ নিলখুরাশি আজ সেই বুকের ওপর শোভা পাচ্ছে ধু-ধু বালুচর।
"এই গঙ্গা পদ্মা নদীর দৈর্ঘ্য ছিলো ২৫৯২ কিঃ মিঃ এবং জল নির্গমন এলাকা ছিলো ৬৮১২০০ কিঃ মিঃ এর গড় প্রবাহ শুকনা মৌসুমে ছিলো প্রায় ৮০,০০০ কিঃ থেকে এবং বর্ষ মৌসুমে ৭০০,০০০ কিউসেক। এর প্রশস্থতা ছিলো প্রায় ১৫ কিঃ মিঃ- ২০ কিঃ মিঃ"। (ঢাকার ইতিহাস ১ম বসন্ত যতীন্দ্রমোহন রায়)।

ইছামতি

আধারগ্রাম অঞ্চলের বুকের ওপর দিয়ে এঁকে-বেঁকে প্রবাহিত হয়েছে লাস্যময়ী মানুষের মন ও হৃদয় জয়কারিনী ইছামতি নদী এরই দুতীর ঘেঁষে বাঁকে-বাঁকে গড়ে উঠেছে বড় বড় হাট-বাজার, ব্যবসাকেন্দ্র। গড়ে উঠেছে স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, এরই কুলে রয়েছে কত কবরস্থান-গোরস্থান-স্মশান। এই ইছামতি তীরে ছিলো হিন্দুদের পঞ্চতীর্থস্থান। যেমন ঃ তীর্থঘাট, আগলা, শোলপুর, বারনীঘাট এবং যোগিনীঘট। যোগিনী ঘাট ইছামতির সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এই ইছামতিকে ঘিরে কত যে রুপকথা-উপকথা-ব্রেতকথা ছিলো তা বলে শেষ করা যাবে না। বিশেষ করে আমাদের অঞ্চলে ইছামতির উৎপত্তি ও পতন সম্মন্দে নানামুঠির নানান মত ছিলো। ছোটবেলা এ নিয়ে আমাদেরও কম জল্পনা-কল্পনা কৌতুহল ছিলো না। কারো মতে যমুনা হতে, কারো মতে গঙ্গা হতে কারো মতে ধলেশ্বরী হতে এবং কারো কারো মতে ব্রক্ষপূত্র হতে উৎপত্তি এবং প্রায় সকলেরই ধারনা ছিলো যে এর পতন ধলেশ্বরীতে। তাই অঞ্চল বাসীর জ্ঞাতার্থে যতীন্দ্রমোহন রায়ের লেখা "ইছামতি" রচনাটি তুলে ছিলাম।

"পশ্চিম ঢাকার নদীসমূহ মধ্যে ইছামতিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। মিঃ এ, সি, সেনের রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই নদী জাফরগঞ্জের দক্ষিনে গুরা সাগরের মোহনার বিপরীতদিকে নাগপুরের ফ্যাক্টরীর নিকট হতে উৎপন্ন হয়ে মুন্সিগঞ্জের সন্নিকঠবর্তি যোগিনীঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত। জাফরগঞ্জের উত্তরে ইছামতির প্রবাহ নির্নয় করা খুবই দুরুহ ব্যাপার। মেজর রেনেলের জরিপ সময়ে গঙ্গানদী জাফরগঞ্জের নিকট দিয়েই প্রবাহিত হতো। ধলেশ্বরী তৎকালে গঙ্গার শাখানদী বলেই পরিচিত ছিলো। এর প্রাচীন নাম ছিলো গজঘাটা। এই প্রবাহ এখন প্রায় শুস্ক হয়ে গিয়েছে। এই নদীর উত্তরে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী কারতোয় হতে বর্হিগত হয়ে দিনাজপুরের মধ্যে দিয়ে এসে ঢাকার ইছামতি নদী যে স্থানে শেষ হয়েছে, তার ঠিক বিপরীত দিকে ধলেশ্বরীর সাথে মিলি হয়েছে। মেজর রেনেল নদীর মানচিত্রে যেভাবে এ নদীকে অঙ্কিক করেছেন তাহাতে স্পটই প্রতীয়মান হয় সে, ঢাকার ইছামতি ও দিনাজপুরের ইছামতি অভিন্ন করতোয়ার একটি শাখা নদীই দিনাজপুরের মধ্যে দিয়ে জাফরগঞ্জ হয়ে ব্রক্ষপূত্রের সাথে মিলিত হয়েছে। ধলেশ্বরী নদী পরে উদ্ভুত হয়ে ইছামতির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে উৎপত্তিস্থান হতে একে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। কার্তিকী খোর্নমালিতে হিন্দুগন করতোয়া নদীতে তীর্থপ্রায় করে থাকেন। ঠিক এদিনই পূর্ববঙ্গের নরনারী ইছামতির পঞ্চতীর্থঘাটে স্নান করিয়া পবিত্রতা লাভ করে থাকেন। ইহা হতেও হৃদয়াঙ্গম হয় যে, ঢাকার ইছামতি নদী পূন্যতোয়া-করতোয়াই একটি অপর একটি শাখানদী। অপর একটি ইছামতি নদী পাবনার সন্নিকটে গঙ্গা হতে উৎপন্ন হয়ে জাফরগঞ্জের বিপরীতে দিকে গুরা লাগয়ে পতিত হয়েছে বলে মেজর রেনেল উলে-খ করেছেন। এই ইছামতি এখনও বিদ্যমান রয়েছে। ইহা গঙ্গা ও যমুনার শাখা নদী। এই নদীর স্রোত কখনও গঙ্গা হতে যমুনার দিকে আবার কখন বা যমুনা হতে গঙ্গাভিমুখে প্রবাহিত হয়।

আর একটি ইছামতি নদী নদীয়া ও যশোর জেলায় মধ্যে দিয়ে সাগরে পতিত হয়েছে। মিঃ এ, সি, সেন বলেন, ঢাকা জেলার ইছামতি নদী তীরস্থ ধীবরগন মধ্যে বংশপরম্পরাগত প্রবাদ এই যে, উক্ত তিনটা ইছামতি পূর্বে একই নদী ছিলেন। এ-প্রবাদ একেবারে ভিত্তিহীন বলে মনে হয় না।

আমাদের বিবেচনায় গঙ্গায় পরিতক্ত খাত দিয়েই ইছামতি ও কুশী নদী প্রবাহিত হয়েছে। গঙ্গায় প্রবাহ পূর্বদিকে সরে যাওয়ায় নব গঙ্গায় উদ্ভাব হয়েছে। এ সময়ই যশোরের ইছামতি নদী প্রথমত পাবনা জেলাস্থিত এর উত্তর দিকস্থ প্রবাহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরে গঙ্গার প্রবাহ পুনরায় পরিবর্তীত হয়ে পদ্মার উৎপত্তি হয়েছে।

খাল

আমাদের এ প্রানপ্রিয় ইছামতি নদী হতে উৎপন্ন এবং ইছামতি নদীতে পতিত কয়েকটি উলে-খযোগ্য খাল গ্রামবাসীর, অঞ্চলবাসীর জ্ঞাতার্থে তুলে ধরছি।

১। গোয়ালখালির খাল ও কুটিয়া মোড়ার খাল ঃ ইছামতি হতে উৎপন্ন হয়ে ধলেশ্বরীতে পতিত হয়েছে।

২। সৈমটের খাল ঃ পদ্মা হতে উৎপন্ন হয়ে বান্দুরা বাজারের নিকট ইছামতিতে পতিত হয়েছে। এর এ সঙ্গম স্থানকেই মোহনা বলা হয়।

৩। ইলিশামারীর খাল ঃ এখাল ধলেশ্বরী হতে বড় হয়ে নবাবগঞ্জ, কলাকোপাবান্দুরা, হাসনাবাদ, জয়পাড়া হয়ে পদ্মায় পতিত হয়েছে।

৪। ব্রাক্ষন খালির খাল ঃ ইছামতি হতে বড় হয়ে বালিয়াখালির মধ্যে দিয়ে নবগ্রামের বিলে প্রবেশ লাভ করেছে।

৫। ঘিয়রের খাল ঃ পুরতান ধলেশ্বরী হতে বড় হয়ে ইছামতি নদীতে পতিত হয়েছে।

৬। শিববাড়ির খাল ঃ এখাল ধলেশ্বরী হতে বড় হয়ে বরদিয়া খুলী শিবারয়, নালি, হরিরামপুর, লক্ষীকোল ও নয়াবাড়ির মধ্যে দিয়ে পদ্মায় পতিত হয়েছে। এ খালের দ্বিতীয় শাখাটি হাটিপাড়া, হাসনাবাদ, দেবীনগর হয়ে মারিশান নিকটে পদ্মায় প্রবেশ করেছে।

৭। হরিশকুলের খাল ঃ এ খাল জমগায় সমতলভূমি দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কালীগঙ্গা নদীর সাথে ইছামতি নদীর সংযোগ সাধন করেছে।

৮। চুড়াইনের খাল ঃ ইছামতি হতে বড় হয়ে আড়িয়াল বিলে পতিত হয়েছে। এখাল দিয়ে বিক্রমপুরস্থ শ্রীনগর, জাম্পরা, ষোলবর প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়।

৯। দেওয়ানখালি ঃ পদ্মা হতে উৎপন্ন হয়ে রাস্তা বিলের মধ্য দিয়ে ইমানগর, নয়ানগরের উত্তর দিক দিয়ে হাসনাবাদের নিকট সৈনট খালে পতিত হয়েছে।

১০। কাটাখালি ঃ এ খাল ইছামতি নদী হতে বড় হয়ে বান্দুরা হলিক্রশ হাইস্কুলের পূর্বপাশ ঘেঁষে দক্ষিন-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে চানলাই - বিল পেড়িয়ে আড়িয়াল বিলে প্রবেশ করেছে। এখালাই ছিলো ইছামতির সবচাইতে ক্ষরস্রোতা খাল। সৈনট খাল বাহিত পদ্মার প্রবাল স্রোতধারা এবং ইছামতি নদীর প্রবাল স্রোত বান্দুরা তে মোহনার নিকট মিলিত হয়ে ইছামতি প্রবাল আকার ধারন করে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। তে-মোহনার সঙ্গমস্থান হতে মাত্র-২/৩শ গজ পূর্বেই এ খালের উৎপত্তি। সুতরাং ইছামতির সমস্ত স্রোতই যেন আছড়ে পড়তো এখালে। ইছামতি নদীতে চলমান বড় বড় নৌকা যেমন- পলাশী, শতমনি, হাজারমনি, পানসী এবং ইহা ছাড়া বাশ ও কাঠের ঢালী গুলি ছিট বাঁধা ছাড়া কাটাখালির এস্থান টুকু অতিক্রম করতে পারতো না সিট না বাঁধলে কাঠাখালির কটালের স্থানে পড়ে নৌকা উল্টে যেতো। প্রতি বষায়ই এখালের মোড়ে বড় বড় নৌকাডুবি হতো। তাই ছিট বেধে কাটাখালির স্রোতের টান থেকে নৌকা গুলিকে রক্ষা করা হতো। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই হয়তো ছিটবাঁধা সম্মন্ধে অবহিত নয়। ছিট বাধা হলো নৌকা সোজা পথে চালিত রাখার জন্য নদীর অপর পড়ে বাঁশ বা কাঠের শক্ত খুঁটি গেড়ে গেড়ে নৌকার কাদ্দি সেই খুটিতে বেঁধে বেঁধে আস্তে আস্তে নৌকাকে কটখালির স্রোতের টান হতে মুক্ত করা হতো। অন্যথায় নৌকা স্রোতের টানে উল্টে যেয়ে কাটখালিতে নিমজ্জিত হতো।

এই ইছামতি নদী তীরের কিছু কিংবদন্তী ও সত্য কাহিনী পাঠক সমাজে তুলে ধরছি।

১। মহাকবিকায়কোবাদ ঃ ইছামতি তীরে আগলা গ্রামে কবি কায়কোবাদের বাড়ি। কবি মধুসুদন দত্তের পরই অমিত্রা অক্ষর দ্বন্দে কবি কায়কোবাদের নাম উলে-খযোগ্য। তাঁর রচয়িত মাহশ্মশান কবিতা মহাকাব্যের সমতুল্য।

২। খেলারাম দাতা ঃ ইছামতি তীরে কলাকোপা গ্রামে কিংবদন্তীর মহারাজ খেলারাম দাতার বাড়ি। এ বাড়ির তিনতালা বিল্ডিং এর দু'তালা সম্পূর্ন ধারিত্রীমাতা গ্রাস করে নিয়েছে। রূপকথার মতো শুণালেও ইহা সত্য যে, এই বিল্ডিং এর ছাদের ওপর চৌবাচ্চা তৈরী করে খেলারাম দাতা তাঁর সাথে আমদুধভাত খাওয়ির ছিলেন। এ বাড়ির দক্ষিন দিকে একটা বিরাট দিঘি। ঐ দিঘিতে একটি শেকল ছিলো। এ শেকল দিঘির দক্ষিন পাড়ে বড় একটা গাছের সাথে বাঁধা ছিলো। কিন্তু দিঘির মাঝে কি যে বাঁধা ছিলেন তা কেহ নির্নয় করতে পারেনি। এ শেকল ৫০ এর দশকে আমরাও দেখেছি। খেলারাম দাতাকে নিয়ে অনেক কিসসা কাহিনী ছিলো -এ- অঞ্চলে। যা এখন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। খেলারাম দাতার মৃত্যুও ছিলো রূপকাথার মতো। তার মা নাকি বলে ছিলেন, "খেলারে বেলাতো গেলো; এখন খেয়েনে।" উত্তরে খেলা বলেছিলেন, "মাগো, তাহলে তোমার খেলাও গেলো। একথা বলেই নাকি দাতা খোলারাম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন।

৩। তেলীবাড়ি ঃ কাঁচ ও পাথর নির্মিত এ বাড়ির অঙ্গ-গোঠ্ঠির শান-বাঁধানো ঘাট, আজও মানুষের দৃষ্টি কাড়ে। এই তেলীসাই ছিলেন কলুশাহ। শর্ষে ও তিল বোঝাই নৌকা নিয়ে পদ্মার পাড় ঘেঁষে তাঁরা যাচ্ছিলেন বেসতি করতো। ভাগ্যদেবী মা লক্ষীর অপার করুনায় ও অসুকস্মায় কলুশাহর ভাগ্য পরিবর্তন হলো। মায়ের কৃপায় শাহ দেখতে পেলেন, পদ্মার পাড় ভাঙ্গনের সাথে ঝড়ছে সোনা রূপা হীরে জহরত। কলু তাঁর নৌকায় মালামাল পদ্মাতে বিসর্জন দিয়ে নৌকা ভরে নিয়ে আসেন হীরে জহরত মনি-মুক্তা। তারপর রাতারাতি কলুশাহ বনে খান তেলীশাহ।

৪। বিখ্যাত খেলার মাঠঃ কোমরগঞ্জ গ্রামে ইউনুস সারইং এর বিখ্যাত খেলার মাঠ। এ মাঠে ফুটবল খেলার হতো। শীল্ডের খেলা। কলকাতা থেকে ইষ্টবেঙ্গল এবং মহনবাগান টিম দুটি আসতো খেলায় অংশ গ্রহনের জন্য। এবং ঢাকা শহর থেকে আসতো বি, জি, প্রেস; ভি, সি, মেল; ভিক্টোরিয়া ক্লাব ইত্যাদি। এ মাঠে ফাইনাল খেলা দেখার জন্য দেশ বিদেশ, বিশেষ করে কলকাতা থেকে অনেক লোকজনের সমাবেশ ঘটতো। এ খেলার ট্রফি দুটো ছিলো সত্যি দর্শনীয় ও আকর্ষনীয়। এতোবড় শীল্ড ও কাপ এতদাঞ্চলে তো দূরের কথা, কলকাতা এবং ঢাকা শহরেও কোন খেলায় দেখা যেতো না। সাড়েং বাড়িতে এ সব টিমের লোকজনদের থাকা- খাওয়ার ব্যবস্থা থাকতো। এখন সে মাঠও নেই-খেলাও নেই।

৫। ওস্তাদ পিটার ঢার্লি গোমেজ ঃ আমাদের আঠারগ্রাম খ্রীষ্টান সমাজে প্রথম কৃতিধর সঙ্গীতজ্ঞ দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না। তাঁর যশঃখ্যাতি প্রজ্ঞা সারা ভারত- পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সঙ্গীত জগতে বিদিত ছিলো। তিনি ছিলেন ধীরস্থির স্বল্পভাষী একজন প্রখ্যাত ওস্তাদ বা সঙ্গীত গুরু। বাংলাদেশের প্রথিতযশা সিংহভাগ শিল্পীই তাঁর হাতে গড়া। তার অবদান শুধু খ্রীষ্টান সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন সর্ব জনীন একজন ওস্তাদ বা গুরু।

৬। নাট্য পরিচালকঃ- তদানীন্তকালে আমাদের আঠারগ্রাম খ্রীষ্টান সমাজের বিখ্যাত ও প্রখ্যাত নাট্য ভিনেতা ও নাট্য পরিচালক ছিলেন প্রয়াত লরেন রোজারীও (ফকির)। তাঁরমতো সুদক্ষ ও শক্তিশালী নাট্য পরিচালক আমাদের আঠারগ্রাম সমাজে আর কেই ছিলেন না। কলকতার বুকেও তিনি ছিলেন একজন সদুক্ষ নাট্য পরিচালক তিনি যখন কলকাতা সেন্ট যেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়নরত ছিলেন, তখন থেকেই তিনি নাট্য পরিচালনা ও অভিনয় করতেন।
আমাদের আঠারগ্রাম সমাজের আর একজন দক্ষ ও শক্তিধর অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক ছিলেন প্রয়াত আন্থনী বিমল গাঙ্গুলী। তিনি ছিলেন তৎকালীন পরিচালক লরেন্স রোজারিওর সহকারী। তাঁর কাছ থেকেই লরেন্স রোজারিওর অভিনয় দক্ষতা ও নাট্য পরিচালনার বিষয়ে খুটি-নাটি অনেক কিছু জানার সুযোগ পেয়েছি। এই প্রয়াত ও শ্রদ্ধেয় আমার নাট্যগুরু আন্থনী বিমল গাঙ্গুলীর কাছে এবং আমার পরমার-ধ্য নাট্যগুরু ও শিক্ষাগুরু প্রয়াত ও শ্রদ্ধেয় >শ্রী শ্রী এজেন্দ্র কুমার দাস মহোদয়ের কাছে আমি আমার অভিনয় জীবনে বিশেষভাবে ঋনী।

৭। ধলা-কালার লড়াইঃ-এই ইছামতি গাং-এই চলতো ধলা-কালার লড়াই। ইছামতি নদী ও সৈনট খালের সঙ্গম স্থলেতে- মোনায় ইছামতি বাহিত স্বচ্ছ কালো পানি এবং সৈনট খাল বাহিত খোলা পানি সহজে একের সাথে অপারের মিল হতো না। স্রোতের ঘর্ষনে কালোপানি ও ঘোলাপানির বড় বড় গোল-ার সৃষ্টি হতো এবং এ-গোল-াগুলি ওপর-নীচ হতে হতে দুমাইল দূরবর্তী কলাকোপা পর্যন্ত দেখা যেতো। সত্যি বলতে কি এ দৃশ্য হয়তো এ্ নদীতে আর কোনদিনই দেখা যাবে না।

৮। সোনার নাও -পবনের বৈঠাঃ- হিন্দুদের কোন এক ধর্মীয় তিথিতে গভীর রাতে নাটি ইছামতি নদীর বুক থেকে সোনার নাও পবনের বৈঠা সহ উঠে পাদ্রীকান্দা হালট অতিক্রম করে চকে বয়দার বাড়ি সংলগ্ন তেলার বিলে অর্থাৎ ধলিতে যেয়ে ডুব দিতো। ঐ তিথিতে নাকি হালট সংলগ্ন বাড়িগুলির অনেকেই রাতে নৌকার নাচ গান ও ঝুমুর-ঝুমুর শব্দ শুনতে পেতো।

৯। গঙ্গীমার দুই কুমঃ- (ক) ইছামতি নদীর দক্ষিন পাড়ে পুরাতন বান্দুরা গ্রামের পাটনী বাড়ি ও জেলে বাড়ি সংলগ্ন স্থানের গভীরকুম। এ-কুম ঘিরে জাল ফেলতো জেলেরা। কোন এক মাসে হিন্দুদের পার্বনের তিথিতে ঐ কুমে কেহ ডুবদিলে তাকে গঙ্গীমা ধরে নিয়ে যেতো। আমি তখন ছোট। শুনতে পেলাম এ-কুমে একজেলে ডুব দিয়েছে সে আর উঠতে পারেনি। গঙ্গীমা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। জেলের নাকি জাল দিয়ে পুড়ো কুম ছেয়েও লাশের কোন সন্ধান করতে পারেনি। কৌতুহল বশতঃ আমিও সেখানে গিয়েছিলাম দেখার জন্য। কিন্তু লোকজনের ভীর ছাড়া অন্য কিছুই দেখতে পাইনি। কয়েকদিন পর শুনলাম যে, একজন নামকরা তান্ত্রীক এসে মন্ত্রপাঠ করে ফুলের মালা কুমের মধে ফেলার পর লাশ ঐ ফুলের মালার ভেতর দিয়ে ভেসে উঠে।

ইছামতির উত্তর পাড় সংলগ্ন সুইচানীর কুম। এ-কুম পুড়ো সুইচানী বাড়ি এবং কুটিমানিকের বাড়ি গ্রাস করে নিয়েছে। এতো সাধারন ব্যাপার। নদীর ভাঙ্গনে হলো নদীর ধর্ম। কিন্তু কিংবদন্তী হলো এ কুমের পুড়ানো ইতিহাস। এ-কুমের উত্তর দিকে নাকি বড় একটা সুরঙ্গ ছিলো। যা সুইচানী বাড়ি ও কুটির বাড়ির নীচ দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত প্রবাহিত ছিলো। একবার এক জেলে এ-কুমে জাল ফেলে মাছ ধরার জন্য। কিন্তু তার জাল আটকে যায় কুমের মধ্যে। অনেক সাধ্য সাধনা করেও জাল ওপরে তুলতে পারেনা সে। অগত্যা মন্ত্রবলে আবদ্ধ করে সে জাল তুলার জন্য কুমে ডুব দেয়। সে ছিলো খুব বড় একজন তান্ত্রীক। কুমে ডুব দিয়ে সে দেখতে পায় চিতালরূপী গাঙ্গীমা ঐ সুড়ঙ্গের মুখ আটকে রেখেছে। যারদরুন তার জালও আটকা পড়েছে। তখন সে ওপরে উঠে মন্ত্রপাঠ শুরু করে। মন্ত্রবলে সে চিতলরূপী গাঙ্গীমাকে সেখান থেকে বিতারিত করে দেয়। জেলে তার মান নিয়ে চলে যায় বটে। কিন্তু সুইচানী বাড়ি আস্তে আস্তে ইছামতি গর্ভে বিলীন হতে থাকো। সেসময় সুড়ঙ্গ পথ বন্ধ রাখার আর কেহ চিলেন না। এসব কিংবদন্তীর গল্প শুনতে কিযে আনন্দ পেতাম তা বর্তমান প্রজন্মের কাছে বলে শেষ করা যাবে না।

বড়দিন - উপহার

মেরী ডি' কস্তা, *টরেন্টো, কানাডা*

অক্টোবরের শেষ্। হেমন্তের পড়ন্ত বিকেল। সুন্দুর আবহাওয়া। আজও হালকা জামা পরেই রেরিয়ে এলাম। এখনও গাছগুলো পত্রশূন্য হয়ে যায়নি। গাছে গাছে শোভা পাচ্ছে নানাবর্নের পাতা। আবাসিক এলাকাবাসী গন লনের পাতা পরিস্কার করায় ব্যস্ত। বান্ধবী সমান্থা ও আমি যাচ্ছি ডিক্সি মলে। বিশাল বড় মল। এত সন্দুর বিকালে বাড়ীতে বসে থাকতে একেবারেই মন টিকছিল না। এ সপ্তাহান্তে আমার স্কুল বান্ধবী সামান্তার ছোট্ট কনডেমিনিয়ামে বেড়াতে এসেছি।

{চল স্টারবাকে গিয়ে বসি একটু । কফি খেয়ে না হয় মলে ঘুরে বেড়াব।

{হ্যাঁ, চল।

{স্টারবাকে ঢুকতেই "হাই জুলিয়া" ডাকে জনকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

{বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই বললাম হাই জন কেমন আছ?

{জন বলল- ভাল, ধন্যবাদ। তুমি কেমন আছ?

বললাম - ভাল আছি, ধন্যবাদ।

{এসময় কেন জানি না কোন কৌতুহলে দুজনই দুজনার শূন্য অনামিকার দিকে চোখে বুলিয়ে নিলাম।

{জন পাশ্বে দাড়িঁয়ে থাকা মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল - ও হচ্ছে কেইটি। আমাকে দেখিয়ে বলল, আর এ হচ্ছে আমার বান্ধবী জুলিয়া।

হাই বলে মুচকি হেসে হাত বাড়িয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করে কফি পিয়াসুদের পিছনে লাইনে লাইনে দাঁড়ালাম। জন ও কেইটি কফি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বিদায় জানিয়ে গেল। মনের অজান্তে কেন জানি না বুক চিরে গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

জনের সঙ্গে আমার সর্ম্পক ছিল দীর্ঘ সাত বছরের। তখন সবেমাত্র একাদশ শ্রেনীতে পড়ি। বাড়ির পাশ্বেই একটা মনোহারীর দোকানে সপ্তাহান্তে কাজ করি।

সেদিন ছিল শনিবার । শীতকাল। সারাদিনই ক্ষনে ক্ষনে তুষারপাত হচ্ছে। খুব বেশী ক্রেতার আগমন হয় নি। রাত ন'টা নাগাদ দরজা বন্ধ করতে যাব এমন সময় এক যুবক দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই বলল, "একেবারেই বাজে আবহাওয়া। তোমাদের দুমরিয়ে আছে নাকি ?

বললাম- হ্যাঁ আছে।

বলল, দাও তো এক প্যাকেট।

বাড়িয়ে দিলাম সিগারেট প্যাকেট।

ভাংতি পয়সা ফেরত দিতে গিয়ে পরিপূর্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মাথার হুড নামিয়ে নিয়েছে সে। মাথাভর্তি সোনালী চুল, লম্বায় ছফুট । বড় গভীর নীল দুটো চোখ কৌতুকে ভরা।

হাসোজ্জুল মুখে ছেলেটি বলল, আমি জন । কাছাকাছি থাকি। বাইরে যেমন দর্যোগ শুরু হয়েছে, তুমি বাড়ি যাবে কি ভাবে?

বলালম- আমি কাছেই থাকি । হেটে চলে যেতে পারবো।

জন বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

আমারও যাবার সময় হয়েছে। মালিককে শুভরাত্রি বলে কোট ও গ-ভস পারে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে দেখি জন দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে। আমি বাড়ীর রাস্তা ধরলাম। জনও পিছু নিল। কেমন ভয় ভয় করছে। জন বুঝতে পেরেছে কিনা জানি না, বলল আমি ও এদিকেই যাব তোমার সঙ্গে হাঁটলে কিছু মনে করবে না তো?

আমার আর কেন জানি ভয় করছিল না। বললাম- না।

জন বলল- আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছরই ভর্তি হয়েছি। তুমি কি করছ? ও ভাল কথা, তোমার নামটাতো জানা হয়নি।

বললাম- আমি জুলিয়া, দ্বাদশ শ্রেনীর ছাত্রী। সপ্তহান্তে কাজ করছি।

ইতিমধ্যে বড়ির কাছাকাছি চলে আসতেই বললাম, ডানের এ গলিটার শেষ মাথায় আমাদের বাড়ী। ধন্যবাদ ও শুভরাত্রী জানিয়ে হাঁটতে লাগলাম বাড়ির দিকে।

জনও শুভরাত্রি জানিয়ে বলল- আমাকে আরও খানিকটা পথ এগিয়ে যেতে হবে।

পরদিন রবিবার সকাল দশটায় দোকানে এসে গোছগাছ করে ক্যাশে এসে দাঁড়ালাম। আবহাওয়া নেই মাতন্ততা আর নেই। তুষার পাত কমেছে।

দরজা ঠেলে জন এসে সামনে দাঁড়াল। রাতের চেয়ে দিনের আলোতে তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

বললাম- হা,ই জন।

জন বলল- 'দুমিরিয়ে' দাও আরেক প্যাকেট।

বাড়িয়ে দিলাম সিগেরেটের প্যাকেটটি।

দাম চুকাতে চুকাতে ও বলল- এখনই আমার সিগারেটের দরকার নেই। তবুও এলাম একটা কথা জিজ্ঞেস করতে। আজ সন্ধায় কি তোমার কিছুক্ষন সময় হবে? কফি খাব।

লজ্জা পেলেও জনের চোখের দিকে সারাসরি তাকিয়ে দেখলাম কোন কপটতা নেই সেখানে। বললাম- হ্যাঁ, যাব।

জন বলল- কটার সময়?

বললাম- সন্ধা ছয়'টা।

সেই শুরু । আমাদের সর্ম্পক ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। ইতিমধ্যে জন ব্যাচেলর ডিগ্রি নিয়ে ভাল চাকুরী পেয়ে মফস্বলে গেছে। আমি পড়াশুনায় আরও বেশী মনোযোগী হয়েছি। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে পড়ছি এমন সময় অবধারিত পরিনতির কথা ভাবতে হয়েছে। আর সেসময়ই মনে হল এখন বিয়ে করা কিছুতেই উচিত হবে না।

এরপর থেকেই যেন দু'জনের সর্ম্পকের দূরত্ব বেড়ে যেতে যেতেই যোগাযোগও একসময় বন্ধ হয়ে গেল।

{এর মধ্যে বিভিন্ন ছেলে বন্ধু এসেছে কখনও গভীর কোন ঘনিষ্ঠতা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পেতে পেতেই চাকুরী পেয়ে গেলাম ব্যাংকে। স্টুডেন্ট লোনও প্রায় শোধ করে ফেলেছি। বেশ উন্নতি হয়েছে কাজে। এসময়ই জনের সঙ্গে আবার দেখা । মাকে এসে জনের কথা জানালাম। মাও দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। আসলে বাড়ীর সকলে জনকে আমার হবু স্বামী হিসাবে ধরেই নিয়েছিলেন।

কিন্তু বিয়ে যখন হলো না, তখন আর তারা কিইবা করতে পারনে।

বড়দিন পূর্বে শেষ দু'সপ্তাহে খুব ধকল গেছে। ব্যাংকে কাজের চাপ, বাড়ীর কেনাকাটা, ঘরে মাকে সাহায্য করা-এভাবেই বেশ ব্যস্ততায় সময় গেছে।

আজ খ্রীসমাস ইভ। মায়ের সঙ্গে ব্যাকিং এ সাহায্য করে সন্ধ্যে নাগাদ হট বাথ নিলাম। আজ মা বাবাকে নিয়ে গীর্জায় যাব মধ্যেরাতে।

তৈরি হতে শুরু কললাম। বাবামাকে বললাম- তোমরাও সকাল সকাল তৈরি হয়ে নাও । একটু আগে ভাগই গীর্জায় যাব। তানাহলে আজকে গীর্জায় জায়গায় পাওয়া দুস্কর হবে।

ডোরবেলের আওয়াজ শুনে দরজা খুলতে এগিয়ে গেলাম, কেননা এ সময় খ্রীসমাস ক্যারল আসতে পারে। দরজা খুলে বাকশক্তি রহিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

জন বলল- আমাকে ভেতরে আসতে বলবে না জুলি? ত্বরিতে দরজা ছেড়ে ওকে ভেতরে নিয়ে বসতে বললাম ।

ও আর ও সুন্দর হয়েছে। গভীর নীল রং এর সুটে কি দারুন মানিয়েছে তাকে।

নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করে জনই পুনরায় বলল- তোমার কাছে কিছু চাইতে এসেছি। উত্তরের অপেক্ষা না করে আবার বলল- তোমার কি আজ রাতে একটু সময় হবে? আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমার আগে যোগাযোগ করে আসা উচিত ছিল। আসলে সে সুযোগও হয়ে উঠেনি।

পরিপূর্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম- হ্যাঁ, হবে। একটু অপেক্ষা কর, মাকে বলে আসছি।

ফিরে এলে জন হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। আমি হাত বাড়াতেই জন হাল্কা চাপে আমার হাতখানা তুলে নিয়ে আলতোভাবে চুমু খেল।

তারপর ও গাড়ীর দরজা খুলে দিতেই উঠে বললাম । গাড়ী স্টার্ট দিয়ে জন তুলে নিল আমার হাত। গাড়ী ছুটে চলছে হাইওয়ে ধরে। সিডিপে-য়ার বেজে চলেছে শ্যানাইয়া টুয়েনের কণ্ঠে আমার প্রিয় গানঃ "From this moment, life has began....".

লেখা আহ্বান

"তেপান্তরী" তে ছাপানোর জন্য আপনার লেখা গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ছড়া, উপন্যাস আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

PBCA P.O. Box 1258, NewYork NY 10159

প্রবাসীর তথ্য পেতে ভিজিট করুন

www.PBCAusa.org

When I Close My Eyes

Mitchell D' Rozario (Turjo), Jersey City, NJ

When I close my eyes, I see darkness as if suddenly all the light has been sucked out and replaced by pitch black backdrop. Through that darkness I see distant specks of light from several mud-thatched houses, roofs which gleam under the moon-light sky. A narrow path leads me to the houses. It feels like a calm winter night and a cool breeze passes by. A group of barefooted boys play a game of badminton with a net perched in between two poles and a pair of bright flashlights hung on each pole. On the other side of the road I can see paddy fields, swaying lazily in the breeze. The surface of the pond glitters under the moonlight. The bushes are set ablaze by the fireflies and the sweet smell of flowers permeates the environment. I near a village house. A kitchen. A nearby cobbled well. It is a one storied mud-brick house with a large porch in front. The red and green flag of sways from the roof of the house as yet another cool breeze flows by. This is the heart of my homeland, the houses, the fields, and the people and their language are what I represent and through all the struggles this small and young nation has been through I could not be any prouder than I am. Rabindranath Tagore's poem "My Golden Bengal", encapsulates the scenic beauty of my country and the people that live there, an image which is not held by many in the west.

Although I was raised in the clamor of the city, the village has been an integral part of who I am. I remember when my parents and I would go on retreats to parts of Bangladesh and traveled the southern mangrove forests of Sunderbans trailing the deer footprints, the northern hill-tracks where the indigenous tribes speak a language of their own, or having long walks on the flat island of St. Martin's during sunset when I was young. The warm tropical weather and the monsoon rains have shaped its landscape and endowed this country with many beautiful types of scenery. Many great poets and writers have been influenced by the rich diversity of nature.

Language is an important tool for any civilization. It is the only way that one can communicate one's likes, dislikes, worries, pains and joys with others. Granted this, no one would like their language to be taken away. I speak in Bengali, a derivative of the ancient Sanskrit, spoken by the people of West Bengal in India and Bangladesh. Rabindranath Tagore was one of the most prominent and influential Bengali poets and won the Nobel Prize for Literature. I have selected one of his poems, "My Golden Bengal" in which he writes about the beauty of Bengal. With metaphors and similes, he describes the natural beauty of the land that he grew up in and calls his motherland. His description is sensual, appealing to three of the senses. He is thrilled by the smell of the mango groves, he writes about the tenderness of the shade like a quilt when he lies under the banyan tree or the soothing melody of nature that sways his heart. He writes, "Forever your skies, your air set my heart in tune As if it were a flute" (verse 2)

Some of the rhymes of the poem have been lost in the English translation. It has an iambic hexameter. The rhyming sequence is a-b-a-b throughout the poem. Although the poem throughout has a optimistic tone throughout, in the final verse Tagore rapidly changes his tone to that of a sad one, "If sadness, O mother mine, casts a gloom on your face, eyes are filled with tears!" (verse 18)

Tagore writes that if his motherland is under threat he would be willing to fight for his country. I find that this poem to be very powerful because when sung by a group in unison, as the national anthem, it fills me with patriotism and a feeling of unity with other people of my country. The poem has a subtle rebellious message to it. The time this poem was written during the time of British rule of India, an overtly rebellious poem would have been censored. Tagore by neither using any harsh words nor criticizing the British rule wrote a very powerful poem on ethnic identity and taking pride in it. The people of Bangladesh have had to struggle for their language and their land, their heritage and pride, but this poem seems to alleviate all those pains and make all those struggles worthwhile.

My parents along with millions of Bengali fought for their freedom in 1971. Bangladesh was placed under the tutelage of Pakistan in 1945 after the separation from the British monarchy. When forced to change their national language to Urdu and adopting the national identity of being Pakistani, the people of Bangladesh revolted - a revolt in which millions took part and millions lost lives in the genocides under the Pakistani army. Many outsiders did not know about this situation or want to take part in the mess. To let those who did not know about the problems in Bangladesh, a concert was organized by Pundit Ravi Shankar and George Harrison. In the Concert for Bangladesh, Harrison sang "Bangladesh" which helped to bring aid to the starving population.

The song is rhythmic and has a rhyme pattern to it. He regularly uses the line, "Bangladesh, Bangladesh" which emphasizes the urgency for aid in the war ravaged country. The verses are well arranged and easy to listen to. In the song the following lines are repeated to show the helplessness of the mass and the country that was under the tyranny of the regime. "And it sure looks like a mess, I've never seen such distress"

Compared to Tagore's poem Harrison's song is different in tone. While Tagore's poem is about the natural beauty of the country, Harrison's song is on the devastation of the country. Tagore writes about the golden paddy fields while Harrison urges the listeners to give some bread for the starving to feed. Harrison's version of Bangladesh is a country in disarray while Tagore writes about his country's natural treasures. The purpose for Harrison's song was to gain support from other countries for the nation and Tagore's poem was to raise awareness among the people of the nation. Since this nation's birth thirty five years ago, it has gone through many trials and struggles, but it has been growing with time. Harrison's Bangladesh is a war-damaged country trying to rebuild itself from scratch, the Bangladesh I see when I close my eyes is the present, and the Bangladesh that Tagore envisions, a country with potential and the optimistic future of the country.

My First Camp Experience

Ronney Rozario, Far Rockaway, NY

This is my first camp experience. It was August 19, 2005.The bus was at Jackson Heights and we were headed to Rocky Mountains, Pennsylvania. The bus left at 1 pm and we got there at 4 pm. But along the way I saw a lot of cool things and scenery such as mountains, lakes, animals and trees. When we got to camp the people that were there, welcomed us. I knew no one but got to know them by there nametags. We were also given t-shirts after giving them our shirts sizes. Then we sat down to eat snacks and refreshments and we met our group and group leaders. Afterwards we rested a little and three or four vans came to pick up our bags to take them where we slept. For the boys they took them to an Indian Tipi. We saw were we slept and left to meet our music and our bible teacher. The Music teacher was Frank. The bible teacher was Jerry Maj. Then we sat down in a room filled with chairs and a stage with equipments for singing and stuff. There we heard the word of God, sung, saw skits and enjoyed our time there. But the first day we were welcomed and were told about the camp and the things we could do there and where things were.

Next is about food, fun, and activities. Every day after we ate breakfast we would sign up for activities to do later in the day. Then we would play, hang around and have fun for a little while. Then we would go to the room that I talked about in the first paragraph. We would sing, see skits, have fun, and hear the word of God. After it was finished that we would go with our group in a comfortable place where we could talk about what we learned and talk about other thing like verses we would have to memorize. These verses were in a folder with other paper about camp. For memorizing these verses, we would get tickets with the inhales of the group leader so at lunchtime we could buy stuff from a table that was set up to those who won these tickets. They were worth 1 dollar. In the last two days we could use real money to buy things like candy. Then the activities that we signed up for, we had to do them. After we do our activities we would eat lunch, go to the "room" and do the same thing that I said in the first and second paragraph. Then we would play. On some days after we played in the afternoon something special would happen. Like we would see animals, go for rides on a tractor around the camp ground.

One special day most of the campers and even teachers would dress up as they were In Bangladesh. This day was and still is called Bangla Day. In the afternoon after eating some of us would do special performances in order to celebrate Bangla day. Some of us would dance; sing some bangla songs and even some English songs.

The camp theme Is "EXTERME Makeover: Heart Edition". The key verse is Jeremiah 29:11-14 which was "For I know the plans for you", declares the Lord "plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call upon me and pray to me and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you" declares the Lord "and will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you", declares the Lord "and will bring you back to the place from which I carried you into exile." One camp teachers was Jerry Maj. From him we learned a lot about Jesus. I learned that he loves me and you all the same and he will love us the same always. We also learned about respect and obeying our parents.

My opinion about camp is that you can learn a lot. Have fun a lot. And enjoy it a lot. For new comers I advise you to go to camp. This year I look forward to going to camp and enjoying it.

বাংলা মিনিষ্ট্রি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সামার ক্যাম্প - ২০০৭

টমাস রায়, নিউইয়র্ক

বাংলা মিনিষ্ট্রি ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই বড়দিন ও শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা। বাংলা মিনিষ্ট্রি একটি সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান যা বাংলা ভাষা-ভাষিদের মধ্যে কাজ করছে। এ প্রতিষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে প্রভু যীশুর বাণীকে সামনে রেখে খ্রীষ্ট ভক্ত ভাই বোন ও তাদের সন্তান-দেরকে খ্রীষ্টের পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করা। খ্যীষ্টের প্রেমের বাণীকে অনন্ত অনিশ্চয়তার পথে ধাবিত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আপনি আপনার ছেলে-মেয়েকে ভালবাসেন ও তাদের উন্নত ভবিষ্যত জীবনের প্রত্যাশা করেন। আপনারা চান যেন, আপনাদের ছেলেমেয়েরা ভাল বন্ধু-বান্ধব পাওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং নিজেকে সঠিক ভাবে মূল্যায়ন করতে শিখে। এ বিষয়ে তারা যেন কোন বিপদে না পরে সেদিক থেকেও আপনাদেরকে সতর্ক থাকতে হয়। বাংলা মিনিষ্ট্রি আপনার ছেলেমেয়েদের সামার ক্যাম্পে ও বিভিন্ন বাইবেল কোর্সের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের পথে নিয়ে আসে এবং উপযুক্ত সন্তান হিসাবে তাদের চরিত্র গঠনে যথাযথ ভাবে সাহায্য করে। বাংলা বাইবেল ক্যাম্প আপনার ছেলেমেয়েকে একটি নিরাপত্তাপূর্ণ নৈসর্গিক পরিবেশে রেখেই তাদের মানসিক বিকাশে সাহায্য করে। ক্যাম্পের পরিচালকগন শত শত ছেলেমেয়েদেরকে পিতা-মাতার অনুপস্থিতিতে সপ্তাহ ব্যাপি বিভিন্ন কার্য্যক্রমের মধ্য দিয়ে সুন্দর জীবন গঠনে নুতন দিগন্তের নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। এই কার্য্রক্রমকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করার নিমিত্ত দলীয় নেতাদের ছয় মাস পর্যন্ত প্রশিক্ষন দিয়ে থাকেন যাতে ক্যাম্পারদেরকে নিরাপত্তা মধ্য দিয়ে অর্থপূর্ণ শিক্ষা দিতে পারেন। ক্যাম্পাররা যাতে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা, ভক্তিপূর্ণ-ভয়শীল জীবন, ইপ্সিত উন্নত জীবনের লক্ষ্যে পৌছতে পারে তার যথাযথ সাহায্য প্রদান করে থাকে। উলে-খিত প্রসঙ্গ ছাড়া বাংলা মিনিষ্ট্রি ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের আর কোন উদ্দেশ্য নাই।

বাংলা বাইবেল ক্যাম্পের নীতিমালা নিম্নরূপঃ

সপ্তাহব্যাপি একটি সুন্দর পৃথিবীতে অবস্থান করানো।

শহরের ব্যস্ততার বেড়া, ট্রাফিকের সমস্যা, বিরক্তিকর শব্দদূষণ, অস্বাভাবিক পরিবেশ থেকে বের করে এনে একটি যুক্ত পরিবেশে অবস্থান করানো।

খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে ও একটি বাংলা সংস্কৃতিপূর্ণ পরিবেশে এক সপ্তাহকাল অবস্থান করানো।

বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে সপ্তাহকাল ধরে ক্যাম্পারদের মুখে হাসি ফুটানো যা সারা বৎসর তাদের স্মৃতিতে স্মরনীয় হয়ে থাকবে।

ছেলেমেয়েদের ভালবাসে এমন বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত লোকদের কাছ থেকে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের মূল নীতিমালা শিক্ষা লাভ করা।

একসপ্তাহের ক্যাম্পে ক্যাম্পাররা বাঙ্গালী ও অন্য কমুউনিটির ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক দীর্ঘ মেয়াদী বন্ধুত্বের সেতু বন্ধন করে।

ক্যাম্প সপ্তাহে ক্যাম্পাররা নানা ধরনের হস্তশিল্প তৈরি করে যা ক্যাম্পের শেষে তারা বাড়ি নিয়ে যায়।

ইশ্বর যে তাদের কত ভালবাসেন তা তারা বিশেষ শিক্ষাও খেলা-ধুলার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করে।

উলে-খিত ব্যাখ্যা ও নীতিমালার ভিত্তিতে বাংলা মিনিষ্ট্রি প্রতি সামারে বাইবেল ক্যাম্প পরিচালনা করে থাকে। বিগত ২০০২ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত প্রতি সামারে এই বাইবেল ক্যাম্প পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০০৬ সালে নিউ ইয়র্ক থেকে ৪১ জন ক্যাম্পার ক্যাম্পে যোগ দিয়েছে। ক্যাম্পারদের সাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে এদেশের নিয়ম মত খাবার পরিবেষন করা হয়। তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সার্বক্ষনিক আর, এন অবস্থান করেন। ২০০৭ সালের ক্যাম্প পেলসালভেনিয়ার রক মাউন্টেনে অনুষ্ঠিত হবে। ক্যাম্পের তারিখ আগষ্ট ১২ থেকে ১৮ পর্যন্ত।

ভ্রমন - উত্তর আমেরিকার প্রবাসী বাঙ্গালী খ্রীষ্টভক্তদের ফ্রান্স স্পেন এবং পর্তূগালে দ্বিতীয় তীর্থযাত্রা

জন রড্রিকস্, উডসাইড, নিউইয়র্ক

এবারের তীর্থযাত্রার সবাই ছিল মা মারীয়ার তীর্থযাত্রা উত্তর আমেরিকার নিউ জার্সি, নিউইয়র্ক এবং ম্যারীল্যান্ডে বসবাসরত ২২ জন পুরুষ ও নারীর সমন্বয়ে গড়ে উঠে এই দ্বিতীয় তীর্থদল। এই তীর্থদল ৭ই জুলাই থেকে ১৬ই জুলাই পর্যন্ত ফ্রান্স, স্পেন ও পুর্তগালে মা মারীয়ার তীর্থে অংশ গ্রহন করেন। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন নিউ জার্সি থেকেঃ ফাদার ষ্ট্যানলী গমেজ (আদি), রবার্ট গমেজ (আদি), নোয়েল গমেজ (আদি) এবং ফিলোমিনা গমেজ। নিউইয়র্ক থেকেঃ এমেলিয়া ডি রেজোরিও, মার্থা গমেজ, সস্ত্রীক জন রড্রিকস, সস্ত্রীক মার্টিন গমেজ, সস্ত্রীক যোনাস গমেজ এবং বার্নাডেট গমেজ। ম্যারীল্যান্ড থেকেঃ সস্ত্রীক কালিসটুনা গমেজ, যোয়াকিম গমেজ, তেরেজা ডি' ক্রুজ, সাবিনা গমেজ, রবিন ডি কস্তা, মারীয়া দেউড়ী এবং ব্রাইন দেউড়ী। সর্বোপরি এই তীর্থদলের উদ্যোগতা এবং আধ্যাতিক পরিচালক ছিলেন শ্রদ্ধেয় ফাদার ষ্ট্যানলী গমেজ (আদি)।

৭ ই জুলাই ২০০৬ সালের দিনটি ছিল শুক্রবার। ঐ দিন থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত অভিজ্ঞতা, একটা অনুভুতি, সুন্দর মানুসিকতার বহিপ্রকাশই হল আমাদের তীর্থযাত্রার সার-কথা। সর্বাগ্রে ধন্যবাদ বা সাধুবাদ যদি জানাতে হয় তাহলে আমি বলব তার একমাত্র দাবীদার আজকের কৃতী-সন্তান এবং আমাদের স্নেহাস্পদ ফাদার ষ্ট্যানলী গোমেজ। তারই অনুপ্রেনায় আমরা সবাই মিলে মোট ২২ জন তীর্থযাত্রী একমন, এক চিন্তা নিয়ে রওয়ানা দিয়েছিলাম আমরিকার নিউজার্সীর নিউআর্ক (Newark) বিমান বন্দর থেকে শুক্রবার সন্ধা ৬.১৫ মিঃ কসটিনেনটাল এয়ার লাইন্স এর বিমানে করে সুদুর ফ্রান্সের প্যারিসের চার্লস ডিগল বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে।

যথারীতি পূর্বেই নির্বাচিত ছিল প্যাকেজ ট্যুরে। বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন সুপরিসর বাস নিয়ে গাইড। তখন স্থানীয় সময় পরের দিন সকাল ৮.৩০ মিঃ। আমাদের গাইড নিয়ে চলল নির্ধারিত হোটেলে। পাথিমধ্যে প্যারিস নগরীর প্রত্যুষ্যের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী জুড়িয়ে দিয়েছিল আমাদের নয়নজুগল। সুন্দর ইংরেজী ভাষায় বর্ননা দিয়ে পরিচিত হতে কোন বেগ পেতে হয়নি কারো। প্রথম দেখা এই ঐতিহাসিক নগরী। উচুঁ-নীচুঁ, কখনও পাহাড়ী, কখনও নীচুঁ ঢালু বেলাভুমি অতিক্রম করে পৌছাল আমাদের নির্দিষ্ট করা স্থানে। পরিদর্শন করাল সাধু ভিনসেন্ট ডি পল এবং সারে কুরী সমাধীস্থলে। সে পবিত্র গীর্জার নাম সেক্রেড হার্ট চার্চ। সেখানে প্রত্যক্ষ করেছি সেই আশ্চর্য্য মেডেল যার পেছনে লেখা ইংরেজী শব্দ 'এম'। মাছে খোদিত হয়েছে দুটা-হৃদয়। তার অনেক কাহিনী রয়েছে। সে দুটি হৃদয় সাধু ভিনসেন্ট ডি পল এবং সারে কুরীর এক অকৃত্রিম ঐশ্বরিক প্রেমের নিদর্শন। ঐ মেডেলটি হল একটা আশ্চর্য্য কর্মের নিদর্শনস্বরুপ। ঐ মেডেলটি পরে অনেকে অনেক আশ্চর্য্য ফল পেয়েছে জীবনে। তা আজও জাতী-ধর্ম নির্বিশেষে যারা অবগত তারা নিজে পরিধান করে থাকে। সেখানে আমাদের ফাদার ষ্ট্যানলী যিনি তীর্থযাত্রী সংগী এবং ধর্মীয় উপদেষ্টা সীমা উৎসর্গ করেন আর নীরবে আমরা সবাই অবনত মস্তকে পরম শ্রদ্ধাভরে প্রার্থনা করতে পেরেছি। আর নিজেকে ধন্য মনে করেছি। এত সুন্দর স্থানে, পবিত্রতায় পরিপূর্ন গীর্জা এবং উচুঁ পাহাড়ের চুড়ায় নির্মিত হয়েছে। সে সব স্থান পরিদর্শন করাতে এতটুকু কুন্ঠাবোধ করেনি আমাদের গাইড। তাকে সাধুবাদ না জানালে নিজেকে অপরাধী মনে হবে। পরদিন আমাদের নিয়ে চলছিল বাসে করে রেল স্টেশনে। রেল গাড়ীতে করে আমাদেরকে নিয়ে এলো ফ্লান্সের লুর্দ নগরে। যার নাম জগৎজুড়ে। যেখানে মা মারীয়া দর্শন দিয়েছিলেন। লুর্দ নগরীতে পৌঁছানোর পূর্বে আমাদের নিয়ে এল বৃহৎ নটরডেম গীর্জায়। সেখানে ফাদার সীমা উৎসর্গ করেন। অপূর্ব প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। সেখানে প্রার্থনা করতে গিয়ে যে কি রকম অনুভুতি হয়েছিল তা নিজের চক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করান কঠিন হবে। সেই গির্জায় ছিল সাধু-সাধ্বিদের অদ্ভুত সুন্দর প্রতিকৃতি সারা দেয়াল জুড়ে। মনে মনে নিজেদেরকে খুবই আশির্বাদিত মনে হয়েছিল। কারন এসব চিন্তা করাটা ছিল একদিন স্বপ্নের আর আজ অবলোকন করলাম সশরীরে, আরও সব পরিবারের সদস্য/সদস্যা মিলে।

তারপর আমদের নিয়ে এল সেই ঐতিহাসিক স্থান লুর্দে। সেখানে সাধ্বি বার্নাডেটকে দেখা দিয়েছিল মা মারিয়া। সেএক অতভুত কাহিনী। সেখানে সেই পবিত্রস্থান পরিদর্শন ছাড়াও সাধ্বি বার্নাডেটের জন্মস্থান, তার জীবনদর্শন, তার সেই আশ্চর্যজনক ঘটনার অবতারনা। সেখানে পৌঁছালে গাইড বলে দিলেন যদি সবাই ইচ্ছে করে তাহলে মধ্যরাতে যে শোভাযাত্রা হয় সারা পৃথিবী থেকে আগত তীর্থযাত্রী মিলে তার মধ্যে যোগদান করতে পারে। তাতে দেখা যাবে এক অপূর্ব স্বগীয় শোভা যা মা মারিয়ার গ্রটোকে ঘিরে পরিবেষ্টিত । অদ্ভুত, অসংবানিত, অকল্পনীয় এক দৃশ্য লুদের গৌরবময় তীর্থস্থান। তারই ঘিরে রয়েছে ঝরনাধার বাহিত হৃদ। সেখান থেকে পানি উদ্দিত হয়েছিল সাধ্বি বার্নাডেটের জন্য। কথিত আছে মা মারিয়ার রুগ্ন সাধ্বী বার্নাডেটকে আদেশ করেছিলেন পানির কথা। সেখানে ছিল শুধু কঠিন পাথরে আবৃত ভুমি। আর ছিল তারি চারিদিকে বিভিন্ন গাছ গাছরায় ভর্তি চারন ভুমি। সেখানে ঐ কঠিন শিলা থেকে পানির আবির্ভাব হওয়া ছিল এক অচিন্তনীয় ব্যপার। কিন্তু মা মারিয়ার নির্দেশে সেখানে ঐ শীলা ফেটে বের হয়ে এসেছিল পানি আর পানি নিয়ে অসুস্থ্য ব্যক্তিরা

Saragosa, Spain: In front of our Lady of Pillars

আরোগ্য লাভ করেছে শত শত মানুষ সারা পৃথিবী জুড়ে। আজও সেখান থেকে পাবিত্র জল বিতরন করে হাজার লাখো তীর্থযাত্রী সারা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। সেই পবিত্র স্থানের গ্রটোতে অর্পন করেন মীসা আমাদেরই মাতৃ ভাষায় ফাদার ষ্ট্যানলী গমেজ।

এমন একটি স্থানে যে আমরা কোনদিন যেতে পারব তা যেন ছিল স্বপ্নাতীত। পরের দিনও একই ভাবে রাতের মত আবার শোভা যাত্রায় যোগদানে সক্ষম হয়েছিলাম আমরা সবাই। পবিত্র রোজারী মালা জপ আর মা মারীয়ার অপুর্ব স্বর্গীয় রূপ পরিদর্শন যেন স্বপ্নের মত গেথে রয়েছে সাড়া দেহ মন জুড়ে।

এরপর আমাদের সাধ্বী বার্নাডেটের নিজ গ্রাম এবং বাসস্থান পরিদর্শন করিয়েছিলেন গাইড।

সারাক্ষন বনর্নার মাঝে অবহিত করিয়েছিলেন সব অশ্চর্য্য কথা কাহিনী, আর লোকগাঁথা প্রত্যক্ষ করেছি আমরা সবাই। হেঁটেছিলাম চড়াই উৎরাই পথ বেয়ে এখানে সেখানে। কখনও পাহাড়ের চুড়ায়, কখনও বেলাভূমি পাড়ি দিয়ে পরিদর্শন করলাম পবিত্র ভূমি।

পরদিন আমাদের রেল গাড়ীতে করে নিয়ে চলল প্রায় হাজার মাইল দূরে স্পেনের সারাগোজা নগরীতে। সে এক ঐতিহাসিক নগরী। সেখানে পরিদর্শন করা হল লেডী আর পিলারকে। সেখানে মা মারীয়া আবির্ভূত হয়েছিলেন পিলারের উপর। সেখানকার উপসনালয়গুলি ছিল যেন এক একটা ইতিহাস। বিভিন্ন মামরাজ্যবাদীদের জীবন কথা, তাদের শাসনামল, তাদের উপনিবেশিকতা, নানা রকমের ঐতিহ্যবাহী উপসনালয়, বাসস্থান, বিভিন্ন ভাস্কর্য, রাস্তাঘাট তার নির্মাণশৈলী। সারাগোজার পবিত্র গীর্জাতে উৎসর্গ করেন স্বীসা ফাদার ষ্ট্যানলী। অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে অবলেকন করা হলো সেই ঐতিহাসিক কার্যক্রম। বিভিন্ন সাধু সাধ্বীদের কার্যক্রম আর অবিভূত হওয়ার কাহিনী। পরের দিন আমাদের বাসে করে নিয়ে চলেছিল পর্তুগাল দেশে। সেখানে ছিল লেডি কান্নেজার প্রতিকৃতি। পর্তুগালের ফাতেমা নগড়ীতে গিয়ে দেখেছিলাম আর এক অদ্ভুত, অতি আশ্চর্যজনক ঘটনার, কাহিনীর বাস্ত বরূপ। সে এক অবর্ননীয় শোভা। কথিত আছে মা মারীয়া আবির্ভুত হয়েছিলেন আঠারো বার ঐ তিনজন ঈশ্বরের আশিষপ্রাপ্ত সন্তান লুসি, যাচিন্তা এবং ফ্রান্সিসকে। তারা নানা লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সম্মুখীন হয়েছিলেন বার বার তদান্তিন সরকারের কাছে। তাদের কথা বিশ্বাস করতে চায়নি তারা। কিন্তু মা মারিয়া স্বর্গদুতের মাধ্যমে সংবাদ প্রেরণ করে আবির্ভূত হয়েছিলন। জানিয়েছেন অনেক অনেক কথা তা অনেকের অবগত। যার বানীতে ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনাবলী। পূর্ন্য পিতার মাধ্যমে অবহিত হয়েছিল সারা পৃথিবীর জনগোষ্ঠি।

পরিদর্শন করিয়েছিলেন গাইড ঐ তিন জনের বাসস্থান, পরিচয় করালেন তাদের দৈনন্দিনকার জীবনযাত্রা, তাদের পরিবারের লোকজনদের। নানা ঘটনার অবতারনা যা সত্যিকারে নিজ চোখে অবলোকন না করলে বোধ হয় লিখে বর্ননা দেয়া কঠিন। তারা কত কষ্ট করে জীবন যাপন করেছিলেন অথচ ধন্য হয়েছিলেন মা মারিয়ার অপার করুনায় যা বলতে গেলে বলা যায় আজ তারা চির নিদ্রায় শায়িত

Lourdes, France: In front of Basilica

যদিও পবিত্র কবরস্থানে কিন্তু আত্মা রয়েছে মা মারিয়ার সংগে স্বর্গে। যারা সাধু-সাধ্বী বলে আখ্যায়িত এই স্বল্প দিনের জাগতিক বাসস্থানে। ধন্যবাদ জানাতে দ্বিধা লাগেনা আজ এমন সব ঘটনা বাস্তবে পরিদর্শন করা। ফাদার ষ্ট্যানলী সেখানে সর্বজনের মাঝে অর্পন করেছিলেন মীসা। পরিদর্শন করিয়েছিল গাইড আরও কত উপসনালয় যেখানে গাঁথা আছে ইতিহাসের আশ্চর্য্য সব কার্যক্রম। ফাতেমা শহরে মারীয়ার গ্রটো পরিবেষ্ঠিত স্থানে পবিত্র রোজারী মালা জপ এবং শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহন, একান্ত মনে প্রার্থনা এবং বিভিন্ন নিদর্শন সংগ্রহ ছিল সেখানকার অবস্থানের বিশেষ আর্কষন।

পরদিন আমাদের নিয়ে চলল বাস যোগে পর্তুগালের লিসবন শহরে। সেখানে পৌছালে আমাদের পরিদর্শন করাল ঐতিহাসিক খ্রীষ্টান সন্নাসীদের বাসস্থান, তাদের শৈল্পিক কার্যক্রম, তাদের শিক্ষা, তাদের চিন্তাধারা, তাদের নীতিমালা আজও পৃথিবীর ইতিহাসে রয়েছে যার জ্বলন্ত প্রমান। সারা পৃথিবীর মানুষ যা অবলোকন করেন, অনুসরন করেন যুগ যুগ ধরে বংশানুক্রমে দেখেছিলাম অপূর্ব গাঁথার বাস্ত বরূপ। অদ্ভুত সব কাহিনী যা গ্রহিত রয়েছে সেখানকার প্রতিটি শিলাখন্ডে, মেঝেতে, দেয়ালে আর অবাক হয়ে শুধু শুনেছিলাম বুদ হয়ে গাইডের বিবরনগুলো। পরিদর্শন করেছিলাম লিসবনের নাজারে- নগরে। ঠিক যেন দেখতে নাজারেথীয় অধিবাসীর জীবনযাত্রা। সেখানকার নগরীতে দেখতে পেলাম সে যুগের আকর্ষনীয় কার্য্য সম্ভার। যা ছিল এগার-বার শতাব্দীর কথা। সে যুগের নির্মিত উপসনালয়। এর পরে নিয়ে এল সেই কথিত এবং সর্বজনবিধিসর্ববরেন্য পাদুয়ার সাধু আন্তনীর গির্জায়। তার জন্মকথা, তার বাসস্থান, তার গ্রটো- এসব দেখাতে পেয়ে এতই বিমহিত হয়ে পড়েছিলাম তা বর্ননাতীত। সচক্ষে দেখা এবং সেখানে মীসাতে যোগদান এবং পরম শ্রদ্ধাভরে ফাদার ষ্ট্যানলীর মীসা শেষে বর্ননা শুনে কি এক অবর্ননীয় অনুভুতি হয়েছিল, স্বর্গীয় প্রেম যেন আবর্তীত হয়েছিল ঐ সময়টুকুতে। যতক্ষন ছিলাম সেখানে ততক্ষন যেন এক অপূর্ব আবেশে বিমহিত হয়েছিলাম আমরা সবাই। পরদিন আমাদের লিসবন শহরের বিভিন্ন পরিদর্শনীয় স্থানে নিয়ে দেখানো হয়েছিল যত ঐতিহাসিক নির্দশন। একের পর এক দৃশ্য পথের দুধারে। অতিক্রম করেছিলাম মাইলের পর মাইল অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকনের মাঝে। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেছিলাম এদেশের জীবন যাত্রা প্রনালী, তাদের উপার্জন করার উৎস। এসব শুনতে শুনতে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। দেখেছি তাদের সেই নামকরা অলিভ চাষের ইতিবৃত্তান্ত। তাদের মদ বানানোর কথা, তাদের পশুপালন এবং তাদের চাষাবাদের কথা। ঐসব দেশের মাটি, পাহাড়-পর্বত আর চড়াই-উৎরাই পথ, নদী-নালা, সাগরের তীরভূমি, ব্যবসাস্থল, বীচে, সাগরের তীরে। এসব সত্যি মনে হয়েছে এক অতিব সুন্দর অভিজ্ঞতা, নয়নাভীরাম দৃশ্য, তাদের জীবনযাত্রা, সেই ফ্রান্স থেকে লিসবন পর্যন্ত।

পরিশেষে বলতে হয়, সেখান থেকে একদিন শুরু হয়েছিল ভাষ্ক দা গামার আবিষ্কার অভিযান। সে পূতর্গাল থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত। সেই নৌযান এবং নদী বন্দর আজও বিদ্যমান। সেখান থেকে শুরু হয়েছিল পতুগীর্জ ব্যবসায়ীদের আগমন ভারতবর্ষে এবং কালক্রমে আমাদের বংশ পরিচয়। এত সব পরিচিতি অবলোকন করে সত্যি নিজেদেরকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান বলে মনে হয়েছে। যা হয়ত কস্তিন কালে সম্ভব হতো না যদি না ফাদার আমাদের মাঝে সে প্রেরনা দান করতেন। ধন্যবাদ ফাদার ষ্ট্যানলী, ধন্যবাদ সব পরিবারের সদস্য/সদস্যাদের যাদের সংগে একত্রে মিলে মিশে কাটিয়েছিলাম জীবনের দশটি দিন। আমেরিকা থেকে শুরু করে প্যারিস, ফ্রান্স, স্পেন ও পর্তুগাল হয়ে আবার আপন গৃহ অভিমূখে।

ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি

জে আন্তনী রোজারিও, ধর্মপল্লী, গাজীপুর, ঢাকা

বিশ্বের উন্নত দেশ সমূহের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উন্নততম ও সবচেয়ে ধর্ণাঢ্য। মহা নাবিক কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিস্কৃত হওয়ার পর হতেই পৃথিবীর দূর দূরান্ত, দেশ ও মহাদেশ হতে আগত নানা জাতি, শ্রেনী ও পেশার মানুষ বিভিন্ন সভ্যতার মহামিলন ঘটিয়ে আমেরিকাকে রূপান্ত রিত করেছে এক নব্য সভ্যতার কল্পলোকে বা স্বপ্নরাজ্যে। এ স্বপ্নের দেশে পা রাখার জন্য দুনিয়ার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ড পর্যন্ত মানবকুল মোহাবিষ্ট, আকুল, পাগল ও দিশেহারা। কেউ নাবিক হয়ে, কেউ দেশ বিজয়ী জাতিরূপে, কেউ বা ব্যবসা-বাণিজ্য-কার্য্য-ব্যাপদেশে, কেউ বা পর্যটক হিসাবে, কেউ বৈবাহিক সম্পর্কে, কেউ বা চাকুরী নিয়ে কেউ বা ভাগ্য উন্নয়নের জন্য চোরা পথে, আবার কেউ উদ্বাস্তু হয়ে এসে আমেরিকার বুকে ঠাঁই নিয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ বসবাস করে আসছে। আমেরিকার খাদ্যে ও জলবায়ুতে আয়স্মান হয়ে সর্ব্ব জাতি নির্বিশেষে গণতন্ত্রের মন্ত্রে দীক্ষিত ও অভিষিক্ত হয়ে পরিনত হয়েছে এক মহা জাতিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা দেশপ্রেমিক, সৎ সাহসিক, নৈতিকতার ধারক ও আদর্শের পূজারী। আমেরিকার জনগণ, সীমাহীন উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং দূরদর্শিতা প্রসূত দেশ উন্নয়নের পরিকল্পনা সমূহের যথার্থ ও সুষ্ঠ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দুইশত বৎসরের অধিক সময় দিবারাত্রি অদম্য, নিরলস এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের মাতৃভূমিকে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত করে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী রাস্ট্রে পরিনত করার প্রয়াস পেয়েছে। আমেরিকা শুধ ধনী রাস্ট্রই নয় - পরাশক্তিও বটে। আমেরিকাবাসী মনেপ্রাণে কর্মঠ, অধ্যবসায়ী ও কদাপি পরশ্রীকাতর নয়। দানশীলতা আমেরিকার লোকদের একটি মহৎ গুণ। তাদের পরোপকারীতার মহাত্যে হাজার হাজার বিদেশী নাগরিক আমেরিকা প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে ডি.ভি. ভিসার আশীর্বাদে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৫০জন গভর্ণর শাষিত ৫০টি ষ্টেটের সমন্বয়ে গঠিত। তারকা চিহ্নিত বিশিষ্ট ষ্টে হল - নিউইয়র্ক। ইহা পৃথিবীর সমস্ত দেশ ও রাষ্ট্রের সাথে সমুদ্র ও আকাশপথে যুক্ত। পৃথিবীর মানচিত্রে যদি বিমান পথগুলো লাল রং দিয়ে অংকন করা যায়, তা হলে অতি সহজেই ইহা প্রতীয়মান হয় যে, মাকড়শার জালের ন্যায় সেগুলো নিউইয়র্ক জন.এফ.কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সাথে সংযুক্ত। প্রতি বছর গ্রীষ্ম মৌসুমে সহস্র সহস্র বহিরাগত দর্শনার্থীর পদচারনায় নিউইয়র্ক সরগরম হয়ে উঠে। নিউইয়র্কের অতীব চিত্তাকর্ষক দর্শণীয় স্থান হল - ১. স্ট্যাচু অব লিবার্টি, ২. ব্রুকলীন ব্রীজ, ৩. ভূগর্ভস্থ গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল রেল টার্মিনাল, ৪. নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরী ৫. রকফেলার সেন্টার ৬. এ্যাম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং এবং ৭. আকাশচুম্বি

ইউনাইটেড নেশন্স হেড কোয়ার্টার্স। সর্ব সাধারণের দর্শনীয় তালিকায় "স্ট্যাচু অব লিবার্টি" একটি বিশেষ অপরিহার্য্য স্থান দখল করে আছে। বহির্বিশ্ব হতে আগত জনগণ স্ট্যাচু অব লিবার্টি চোখে একনজর দেখার জন্য উদগ্রীব ও উন্মুখ হয়ে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৭৭৬ খ্রীষ্টবর্ষে ৪ জুলাই গ্রেট ব্রিটেনের শাসনমুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতার জন্য আমেরিকার জনগনকে ইংরেজদের সাথে বহু বৎসর যুদ্ধ করতে হয়েছিল। যুদ্ধ চলাকালে ফরাসীর সৈন্যগণ আমেরিকাকে গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে অনেক সাহায্য করেছিল। তখন হতেই ফ্রান্সের সাথে আমেরিকার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। স্ট্যাচু অব লিবার্টি মুর্তিটি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ফ্রান্সের জনগণের বন্ধুত্বের নিদর্শণস্বরূপ অমূল্য স্মরণীয় একটি ঐতিহাসিক দান।

ফ্রান্সের বিখ্যাত ইতিহাসবেত্ত এডুয়ার্ড দ্য লাবুলয়-এর আমন্ত্রণে ফরাসীর গুরুত্বপূর্ণ ও বিশিষ্ট গুণীন ব্যক্তিবর্গ একদিন নৈশভোজে তার গৃহে মিলিত হয়। নানান সূত্রের আলাপচারিতায় এই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ব্যাক্ত করেন যে মৈত্রীর জ্বলন্ত প্রতীক হিসাবে ফ্রান্সের লোকদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি স্থায়ী উপহার দেয়া অবশ্য করণীয়। এই উপহার হবে পৃথিবীর বুকে সুদূর প্রসারী এক অদ্বিতীয় দূরঅপনেয় বন্ধুত্বের মহার নিদর্শন। সিদ্ধান্ত হয়, ফ্রান্সের জনগণ একটি সুবিশাল মুর্তি তৈরী করতে হবে। প্রস্তাবিত উঁচু আলোক বর্তিকা হাতে এই স্মারক মুর্তি তৈরী করতে হবে।

প্রস্তাবিত উঁচু আলোক বর্তিকা হাতে এই বিশাল মুর্তির নাম হবে "স্বাধীনতার আলো বিশ্বকে উদ্ভাসিত করে।" এই সভায় ফরাসীর বিখ্যাত ভাস্কর ফ্রেডারিক অগাস্টা বার্থ উদ্ভী উপস্থিত ছিলেন এবং প্রস্তাবিত ভাস্কর্য্য তৈরীর প্রতিশ্রুতি দিলেন। বার্থ উদ্ভী আমেরিকা এসে নিউইয়র্ক পোতাশ্রয়ের প্রবেশ পথের সম্মুখস্থ বেডলো দ্বীপ মুর্তি স্থাপনের জন্য নির্দ্ধারণ করলেন। দেশে ফিরেই বার্থ উদ্ভী পরিকল্পিত মুর্তি তৈরী করতে মনোনিবেশ করলেন। ফ্রান্সের জনগন এই মুর্তির জন্য উদার চিত্তে ও মুক্ত হস্তে অর্থের যোগান দিয়েছিল। তামার পাত দিয়ে ৩০০ শত বড় বড় খন্ডে এই বিশাল মুর্তির তৈরীর কাজ শেষ করা হয়। আলোক বর্তিকা ধারক ডান বাহুর দৈর্ঘ্য ৪২ ফিট এবং একটি ৮ ফিট আঙ্গুল সংযোজন করা হয়। মুর্তির মুকুট ৭টি আলোক্ছটা সম্বলিত এবং বাম হস্তে ধৃত স্বাধীনতা ফলকে উৎকীর্ণ করা হয়েছে জুলাই ৪, ১৭৭৬ খ্রীঃ। বড় বড় ১০০ বাকসে ৩০০ খন্ডের তামার পাতের এই বিশাল মুর্তি ১৮৭৫ সালের মে মাসে সমুদ্র জাহাজযোগে ফ্রান্স হতে আমেরিকায় আনা হয়। বেডলো দ্বীপে ৩০০শত খন্ডের তামার পাত জোড়া দিয়ে এই স্বাধীনতার স্মারক মুর্তি পূর্ণ অবয়বে দাঁড় করাতে ১০ বৎসর লেগে ছিল।

অবিস্মরণীয় জাঁকজমকের মধ্য দিয়ে হাজার হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে ১৮৮৬ খ্রীঃ ২৮ অক্টোবর এই মুর্তি উদ্বোধন করা হয়। বেডলো দ্বীপের নূতন নাম দেয়া হয় "স্বাধীনতা দ্বীপ।" ইহা বিশ্বের একটি বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র। এই দ্বীপের যাদুঘরে অনেক দর্শনীয় বস্তু আছে। নিউইয়র্কের সমুদ্র প্রবেশ পথে স্বাধীনতা দ্বীপে দাঁড়িয়ে আকাশের নীলিমায় দক্ষিণ বাহু উর্দ্ধে উত্তোলন করে, দৃঢ় বজ্রমুষ্টিতে আলোক বর্তিকা ধরে, স্ট্যাচু অব লিবার্টি দর্শনার্থী জগৎবাসীদের জানায় সুস্বাগতম। ব্যাটারী পার্ক হতে স্টীমারযোগে সুশীতল সমীরনস্নাত সূর্য্যকিরণ বিম্বিত ঝিকিমিকি নীল জলের ঢেউরাশী অতিক্রম করে স্বাধীনতা দ্বীপে স্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখতে যেতে দেহমনে এক অভূতপূর্ব ও অভাবিত শিহরণ জাগে অজানাকে জানার এবং অদৃষ্টকে দর্শনের অনাবিল আনন্দ ও দুর্নিবার আকাঙ্খায়।

লেখা আহ্বান

"তেপান্তরী" তে ছাপানোর জন্য আপনার লেখা গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ছড়া, উপন্যাস আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

PBCA P.O. Box 1258, NewYork NY 10159

প্রবাসীর তথ্য পেতে ভিজিট করুন

www.PBCAusa.org

বাণী চিরন্তনী

বার্নাডেট তিলু গমেজ, *নিউইয়র্ক*

১। লৌহ দন্ড যেমন পাথরের গায়ে বিদ্ধ হয় না, তেমনি কালো অন্তরে সদুপদেশ ক্রিয়া করে না।

২। ভালো করে না দেখে কিছু পান করবে না - ভালো করে না পড়ে কিছুতেই সই করবে না।

৩। সৎ পরমর্শের চেয়ে কোন উপহার অধিক মূল্যবান নয়।

৪। জীবন যতদিন আছে বিপদ ততদিন থাকবে।

৫। ধৈর্য্য হচ্ছে সকল প্রকার দুঃখ যন্ত্রণার একমাত্র প্রতিকার।

৬। বিশ্বাস হচ্ছে বরফের মতো, খুব শীঘ্রই গলে যেতে পারে

৭। তোমাকে যে নিন্দা শোনায়, তোমারও তারা নিন্দা করে।

৮। যারা তাদের সন্তানদের দোষ ত্রুটি দেখতে পায় না, তাদের সন্তানদের দোষত্রুটির সংশোধন কোনদিনও হয় না।

৯। আলো ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি আর আঁধার হল পাপের ছায়া।

১০। আলো ও বাতাস ছাড়া কুয়াশা কখনো দূরীভূত হয় না।

১১। যুদ্ধ একটি ধ্বংসের বিজ্ঞান।

১২। মেয়েরা মেয়েদের বেশী হিংসা করে। একে অন্যের সুখে ইর্ষান্বিত হয়।

১৩। মানুষের জন্ম ও মৃত্যু দুটোর শুরু ও শেষ হয় যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে।

১৪। জীবন সঙ্গীর প্রয়োজন অপরিসীম। কিন্তু এমন সঙ্গী চাই না যে জীবনকে দুঃসহ করে তুলবে।

১৫। একজন মহিলার সুন্দর হওয়ার চেয়ে ভালো হওয়ার প্রয়োজন।

লক্ষণীয় বিষয়

ডরোথী রোজারিও, জ্যাকসন হাইট্স, *নিউইয়র্ক*

মানুষের বুদ্ধির জন্য, মানুষকে অন্যান্য পশুর মত মনে করা হয়। বুদ্ধিমত্তার অনুশীলন না করলে কিংবা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে এর অনুপস্থিতি ঘটালে? স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ পশুতে পরিণত হয়।

বুদ্ধিমত্তা মানুষের বিচার ক্ষমতা প্রসার করে, ন্যায় অন্যায় বুঝতে শিখায়, যুক্তি-যুক্ত পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে, সৎ কাজে উৎসাহিত করে এবং ব্যক্তি জীবনকে লক্ষ্য মাফিক সাজাতে তাড়িত করে। সাধা-রন পশু ও মানুষের পার্থক্য কোথায়। ব্যক্তি মানব জীবনকে স্বার্থকতায় পরিপূর্ণ করে তুলতে বিভিন্ন বিষয় ভূমিকা রাখে।

ছোট বেলা হতে জীবনের লক্ষ্য নিয়ে রচনা শিখি। এ জীবন একটি নৌকা, বা মটর গাড়ী, ঠিক পথ ধরে না চালাইলে তাহা কাঙ্খিত কুলে পৌছাইতে পারে না। লক্ষ্যবিহীন জীবন ও সুন্দর ও পরিপূর্ণ হতে পারে না। মানুষের চাই আশা এবং ভালবাসা এই দু'টিই যদি কম হয়ে যায় তাহা হলে এই পৃথিবীতে কি করবো? কিছু তো নিয়ে যাবো না দিয়েই যেতে হবে সবাইকে। (যে দেয় সে দাতা) এখানেই তো শেষ নয় এর পরেও আছে স্বর্গ বা নরক - চিন্তা যদি থাকে তবে মানুষ কোনদিন ভুল করবে না এইটি লক্ষণীয় বিষয়।

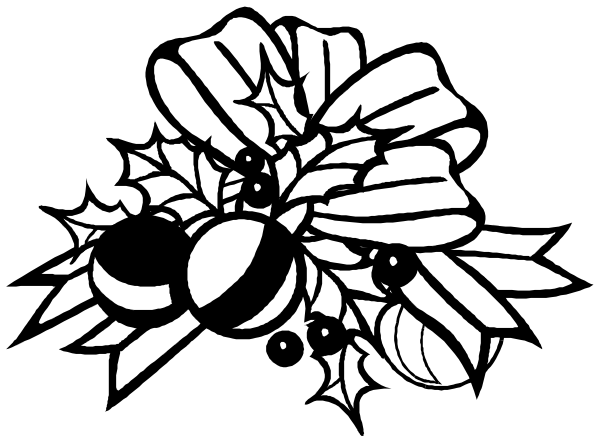

In Memory of Rebecca My Friend and My Wife

Dr. Boniface S. Costa, M.D., Virginia

My first encounter with Rebecca was very accidental. I still remember all the details very clearly as they are etched in my memory permanently. It was a sunny, pleasant afternoon in the spring of 1973 and I was enjoying myself, my afternoon off from the grinding chores of a resident physician, with a few close friends. Later in the evening, we went to a concert of light music. It was a very good and pleasant evening and my friends seemed intensely interested and poised to find out how good this band of relatively unknown singers was. The group came to our town from another, 250 miles to the south by the bay. It was a group of young singers and I was very much impressed by the youngest female member .of the band. She was singing with full confidence and a lot of control and she exuded impressive elegance and a charming aura of grace and dignity about her cute innocent face. I have seen and met more beautiful women before, but never felt so instantly drawn and connected and felt as if I have seen her before and known her for a long, long time. This of course, is not true at all. Suddenly I felt blood rushing through my head, my heart was pounding and I started muttering quietly—— this is the person I have been waiting to meet for a long time. I said I ve got to find out who she is. Surely, I can find a way somehow to meet her. I came home early, leaving my friends behind as I was listening but not able to hear any music any more after such a jolt of an unusual and never experienced emotional turmoil and turbulence. I was dizzy and everything around me appeared foggy and unclear.

This was a totally new experience for me. I spent a sleepless night tossing and turning in bed, trying, all in vain, to get comfortable and have some sleep. I felt very happy but not quite sure why and at the same time very nervous and uncertain. An overwhelming sense of something very good and comforting started looming large in my horizon. I started wandering into the uncharted territory of unbridled romantic journey. My mind kept drifting into the world of all sorts of imaginations which made very little realistic sense . I was in love I muttered to myself, so it seemed, strangely, with some one I knew nothing about. I worried what if she was seeing some one, or worse, she was already married? I was uncertain and confused, all mixed up and nothing made any sense.
My lucky break came very soon indeed when I found that a close friend of mine from knew her family well and I was very happy and elated to find out she was not married and wasn t seeing anybody particularly . I met her accidentally in my friend s house in the evening shortly after that and I very quickly invited her out. Over the following few months we met as much as possible and as frequently as I could manage. We sat down somewhere and talked and I found out you can talk for hours or even days with the same person and yet do not run out of materials or subjects. There is no need to have any rhyme, reason, relevance or substance to have the time of your life babbling about something or nothing. You just talk and keep on talking until blue in the face or your lips become numb and you can make no sound any further. We held hands and walked in the parks through the rose bushes, fed the ducks and geese, walked along the river while savoring the eternal bliss of being together with our dreamy eyes glued to each other. We talked and talked endlessly over the following weeks and months almost regularly and cooked up all kinds of romantic and silly plans for our future together. In the shows and theaters we were more engaged in incessant whisperings and hushed conversation paying little attention to anything else. We were soaring high up in the sky like the majestic birds in flight with no sense of purpose or directions. We hardly were paying any attention to the story line and had no interest in what was happening on the screen. The more I knew her more I liked her and felt inseparably connected and attracted to Rebecca.

She was smart, exuberant, well informed, very funny, very intelligent with a very broad base for varied conversations. I found her extremely sensitive and kind and yet at the same time, very capable of standing up on her own to express her divergent opinion and defend it quite ruthlessly. She was armed with a very natural and instinctive sense of empathy and she could read my mind with magical accuracy. Rebecca could get involved very intensely on almost any discussion on a number of varied issues with rather strong opinion of her own. Soft and flexible, always trying her best to make me happy, she never, however, hesitated to draw the line somewhere when felt necessary to make a point. She would simply draw her line in the sand and never retract from her dug-in position. As much as I disliked her dogged stubbornness, I quickly developed a healthy respect for her opinions.

I was awestruck by her tremendous capacity for caring affection and love and an almost natural nurturing instinct. I found her intellectually very engaging, talking with her and just being with her made me feel very good. I courted her only four months before I proposed to marry her and she gratified me by accepting it. We planned to get married in 2 years, after completion of my medical residency training. Our whirl wind of romantic love was so intense and absorbing that, living away from each other was killing me and life was meaningless without her next to me. I could wait no more and I moved the wedding date closer. We got married on the seventh of February,1974, less than 8 months after I met her for the first time.

Life with my wife was perfect, she made me so very happy and I hardly realized all these 30 years go by so quickly. It feels almost like a dream, a sweet dream full of countless episodes of pleasant memory bytes and endless fleeting moments of lasting joy. She loved my parents and my brothers and sisters like her own. She was such a big hit with my mother, at times it appeared as though she loved my Mom more than I myself, her oldest offspring, ever could have. Our two daughters were raised so well into two mature, well groomed, headstrong, pleasant independent adults, almost single-handedly by Rebecca while I was busy with my heavy load of professional work. Today, with her gone, when I look at my daughters, I see Rebecca all over again. The way these girls laugh, talk, and use hand gestures and body language and live their daily life all are vivid replications of her style and manner. Their social interactions with my friends and relatives are exact replications of Rebecca's .

In an ironic way, it feels she made sure there are plenty of reminders for me to reminisce on our beautiful life together for the rest of my life. I am so glad and thankful for her final gifts to me in the guise of my two wonderful daughters. Our daughters Sheila and Nancy will be my living monuments for my wife s everlasting memory.

Rebecca showed a remarkable knack for

reading my mind and she could anticipate my next move, read my thoughts with an uncanny ease and almost frightening accuracy. She knew what makes me happy and what makes me angry and I could rarely hide anything from her. My wife was always very comfortable, relaxed and sure of herself anywhere under any situation.

She never ever suspected me and my frequent absence from home never worried or bothered her. At times, when she would decline to join me on trips for a medical symposium or conference, I said what if I see someone I like and fall for her while you are not watching me? Typically, she would shrug me off with a mischievous and tomboyish smile and confront—— go ahead and graze as much as you want but no one will ever love you half as much as I do and when, at the end of the day, that becomes loud and clear, you will be right back to me. That was her style, live your life assertively with full faith and confidence in the power of your love. Rebecca knew that was the truth and she believed in me. .She knew how to present herself and feel comfortable under any condition and be totally at ease meeting any body any time. Her enormous capacity for adaptation, her flexible attitude towards the ever changing situations and circumstances in life, are truly rare and very synergistic traits. I have come across few detractors of Rebecca while I have a plethora of them pointing out my lapses and foibles all the time.

Her endless desire to give of herself for others and her strong distaste to be at the receiving end of anything at all etc. are a few of the many very attractive aspects of her personality and character. She was busy and very involved with the schools, churches, soup kitchen for the homeless, senior citizens lunch, to name only a few besides running the affairs of the entire apparatus of my extended household filled with children, brothers, sisters, nieces, nephews and of course, my parents. Doing something for someone impromptu gave her tremendous joy and satisfaction. It was an amazing experience watching her making the total strangers and first time visitors in house very relaxed and comfortable very instantly and almost naturally, time after time. She could be very frankly open and effervescent yet knew how to be private and quiet like a hermit when time or situations required.

She enjoyed life fully and was ever ready to share her resources with family and friends and total strangers. Rebecca loved to entertain and her parties were very popular among our family, friends and neighbors. Having friends over dinner and chat into the nights was her delight. She was a great chef and she always managed to surprise our buddies and me with an array of exotic dishes very routinely. I always wondered how and where did she acquire her amazing culinary skills. Doing everything single handedly and taking care of all the minute details of a party was her way of making sure all will go well and everything will be the best it can be.

Routinely, she would be so exhausted from the stress of it all that she would almost collapse and crash into bed when it is all over and promise herself not to have any more parties ever again. But by the next morning she would be busy planning her next event or yet another party all over again.

Oh, my dear God, I miss my wife, the love of my life so very much. I do not quite know what to do without her next to me. She tried her very best, all in vain, during the last couple of years of her life to prepare me for my journey without her. She worried about such details as my food preparation, my health and fitness, my travel and leisure etc. She talked about my prospective companion, after she was gone and even suggested some names. I have never heard of a dying woman bothering to consider her surviving spouse s future conjugal state. She was emphatic and very strong on instructing me not to have a prolonged period of grief and bereavement after she passed on. As I quietly sobbed and shook like a leaf and writhed in pain and anguish of indescribable proportions at her bedside, she would comfort me and tell me she understood my pain and feeling of utter helplessness. She knew, she said that if roles were to be reversed, she too would feel helpless, despondent and empty. If I were to be the one dying, I would be the stronger one of the two of us. It was all right for me to fall apart but she said, the important thing for me was to get up and get going again. She felt that was the best way for me to remember her. I will never know how and where did she go to get such mind boggling strength and courage to conduct herself in such a remarkable and dignified manner under the threat of imminent oblivion. Facing oncoming death, she was always busy worrying about our children and me, never questioning her own fate and destiny. I had the good fortune of having lived with such a strong and powerful person only by the sheer stroke of good fortune and celestial blessing.

It was remarkable to see Rebecca face her cancer and its treatment, its devastating side effects and the aftermaths of cancer surgery with so much strength, courage, discipline and a definite sense of purpose. I learned a lot from her as I helped her deal with the problems of a cancer patient. Soft and flexible like a vine, she could be extremely rigid, uncompromising and non malleable when she saw it fit. When the cancer returned with full fury in her other lung, she was absolutely firm and irreversible in her decision not to go for another round of chemotherapy.

She dug her feet deep in the sand, and like the most stubborn mule , she thwarted all of my very well rehearsed concerted efforts to get her back to the Oncologist. Instead of risking chronic debility and frequent hospitalizations, she opted to enjoy the remainder of her allocated time on earth with family, friends and spend some quality time with me. She remained true to her decision and never wavered. She never went back to the hospital. She stayed home, received her care given by family members and a host of very close friends who sacrificed work and other vital obligations to be at her bedside on a daily basis We deeply appreciate the loving and caring services of the hospice nurses, social workers and the nurse s aides as well.

Rebecca died on 30th of May, 2003, was buried in a small private cemetery near our home. Standing in the cemetery in front of her, I talk to her frequently. Often I coax, cajole and even beg her to come back for a precious moment only so I can hold her in my arms close to my heart and tell her one more time that I love her so very much. I go visit the gravesite whenever I feel down and out and talk to her all the time. It seems to comfort me and it calms my jittery and frayed nerves. I feel glad and elated when I reflect on our picture perfect life together filled with love, happiness and countless gifts from God. I fall on my knees and thank Almighty God who made it possible for the two of us to meet and travel happily on the same orbit for a few years before being catapulted into our separate trajectories in the Universe of countless twinkling stars. He will make sure that we meet again to be together again for ever and I will wait until that rendezvous comes.
Meanwhile I will be listening to her sweet, soft and gentle singing voice as I hear the quiet whispering wind blowing in from the Chesapeake bay. I will be out on the deck on the river every evening looking at the sky and be pleased and happy to see her smiling face shining through the maze of million stars as its brightest member.

আংশিক হলেও সত্য

ডেভিড স্বপন রোজারিও, *টরেন্টো, কানাডা*

টরন্টো শহরের ড্রানফোর্থ এলাকায়, বাঙ্গালীদের বসবাস সবচেয়ে বেশী। রাস্তার দু'পাশে বাংলাদেশী মালিকানাধীন গ্রোসারিসহ, অন্যান্য পন্য সামগ্রীর দোকানগুলির, বাংলা ও ইংরেজীতে লেখা সাইনবোর্ডগুলি সহজে দৃষ্টিগোচর হয়। এ সমস্ত গ্রোসারিগুলোতে দেশীয় মাছ, শাকসব্জী, নানা মশলা ও খাদ্য দ্রব্যের এক বিপুল ভান্ডার। এমনকি দূর্লভ কাঁঠালের এঁড়ে, কলার থোর, কচুর লতি, সজনে ইত্যাদি সব্জীও পাওয়া যায়। এছাড়াও কাপড়-চোপড়, বাড়ী বেচা-কেনা. ইমিগ্রেশন, রেস্তোঁরা, ব্যাংক, ড্রাইভিং স্কুল, ভিডিও ক্লাব, ছবি তোলা ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় কাজের জন্য ড্যানফোর্থে আসতে হয়। বিকেল থেকে অধিক রাত অবধি বাংলাদেশী রেস্তোঁরা ও দলীয় কার্যালয়ে চলে জমজমাট আড্ডা। বিশেষ করে শনি ও রবিবার কেনাকাটার ধূম পড়ে যায়। উপচে পড়া ভীড় দেখে মনে হবে, ঢাকার ফার্মগেট ফুটপাথ, দিয়ে হাটছি। এখানে দেশীয় আদলে গড়ে উঠেছে সব রাজনৈতিক দলসমুহ। এমনকি জেলাভিত্তিক এসোসিয়েশনও আছে প্রচুর। রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে সোচ্চার হয়ে উঠে। সাংগঠনিক কর্মকান্ডকে আরও গতিশীল করে তুলতে, দলগুলি অন্যান্য কর্মসূচী ছাড়াও মহান জাতীয় দিবসগুলিও নিয়মিতিভাবে পালন করে থাকে জেলা উপজেলা ভিত্তিক এসোসিয়েশনগুলিও সোহাদ সম্ধীতি ও ভ্রতৃত্ব গড়ে তুলতে নিয়মিতিভাবে বার্ষিক বনভজনের আয়োজন করে থকে। যে হেতু দল আছে, দলাদলিও আছে । প্রায়ই বাংলা পত্রিকাগুলোতে একে অপরের বিরুদ্ধে বিবৃত্তি পাল্টা বিবৃত্তি দিতে লেখা যায়। একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বহিস্কার সহ নানা কুৎসা জাহির করে থাকে।

সে যা হোক, এমনি একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা কয়েক বন্ধু আড্ডা দিচ্ছিলাম হঠাৎ এক ভ্রদ্রমহিলার প্রশ্নে সচকিত হয়ে উঠি।

বাবা তোমরা কি বাঙ্গালী ?

হ্যাঁ কিন্তু কেন আনটি? পাল্টা প্রশ্ন করলাম । উঁনি বললেন লিটল বাংলাদেশ দোকানটি কোনদিকে আমার একটু ভীষন দরকার। বললাম ঐ সিগন্যালটা পার হলেই কোনের দোকানটা। শুনেছি দোকানটি নাকি খুব শীঘ্র বন্ধ হয়ে যাবে । তিনি চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন তবু গিয়ে দেখি যদি তারা কেনে । আমি বাবা এদেশে আর থাকবনা এ কাপড়গুলো বিক্রি করে যদি কিছু টাকা পাই এবং আমার কাছে যা আছে তা দিয়ে টিকেট কেটে দেশে চলে যাব । এতক্ষন পরে লক্ষ্য বৃদ্ধার হাতে একটি পলিথিনের ব্যাগ বয়স আনুমানিক ৬০ কি ৬৫ হবে । একটি কালো ওরনা দিয়ে মাথা ঢাকা, মধ্যম গড়ন, পড়নে একটি জজেট শাড়ি এবং পায়ে চপ্পল। আক্ষেপ বললেন অনেক পছন্দ করে গুলশান শুপিং সেন্টার থেকে কাপড় চোপর ও ইত্যাদি কিনে এনেছিলাম, কিন্তু বাবা, তারা আমার জিনিস গুলো ছুয়েও দেখে না। এটুকু সহনাভুতি জানাতেই বৃদ্ধা শিক্ত নয়নের যা বললেন, তার সারমর্ম হচ্ছে, স্নেহের সন্তানের অনেক পিড়াপিড়িতে তাদের সর্বক্ষনিক কাছে পাওয়ার জন্য দেশের মায়া ত্যাগ করে এ বিদাশে এসেছেন, ভেবেছিলেন কত সুখ, কত শান্তি তার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু সবকিছুই বেথা, একটু সহানুভুতি, শ্রদ্ধা ভালবাসা জানোর সময়টুকু তাদের নেই। তিনি গভির দুঃখ করে বললেন, এখন আমার যা অবস্থা, যদি হেটে দেশে চলে যাওয়া যেত, তবে আজই চলে যেতাম।

কানাডাতে এখন সামার। সূর্য ডোবে প্রায় রাত ৯টায়। চারদিকে আলো ঝলমলে সুন্দুর সকাল, চমৎকার অবহাওয়ার মাঝে আমি দাঁড়িয়ে আছি। সামারের যে দিন গুলো জন্য শীত প্রধান দেশের লোকজন, আকুলি বিকুলি করে, ততপুরি বিশ্বের একটি অত্যাধনিক স্বপ্নের দেশ ছেড়ে ভ্রদ্রমহিলা সকল সর্ম্পক ছিন্ন করে চিরদিনের জন্য চলে যেতে চাচ্ছেন, বিস্ময়ে অনেক্ষন তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কি ব্যাথা তার হৃদয়ে, তা বোঝার অনুভুতি যে হারিয়ে ফেলেছি। তিনি বলে যাচ্ছেন, প্রথম প্রথম আমার কত আদর যত্ন, ভালবাসা। আমার রান্না ছাড়া কোন কিছুই তাদের ভাল লাগতো না, কত প্রশংসা সে রান্নার । আর এখন রান্ন করে রাখলে, কেই ছুয়েও দেখেনা । কারো সঙ্গে ফোনে কথা পর্যন্ত বলতে দেয় না, কোন পার্টিতে নিতে চায় না । আমি নাকি মানুষের কাছে ঘরের বদনাম করি। নানা মিথ্যা অপবাদ আমাকে দেয়। যতরকম মানসিক চাপের মধ্যে রাখে। নিজেরা যার যার মতো খেয়ে ওঠে যায়। আমাকে কেউ আর আগের মত খেতে ডাকে না। নাতি নাতনি পযর্ন্ত ডাকে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে হ্য বা না বলে কেটে পড়ে। এ কেমন ব্যবহার বাবা? বৃদ্ধার প্রশ্নের কি আর উত্তর দিবো? সান্তনা দেওয়ার জন্য বললাম, আনটি এদেশের সবাই মহাব্যস্ত, নিজেরটা নিজে করে ক্ষেতে হয়, সবাই স্বাধীন। স্নেহ ভালবাসা, শ্রদ্ধা ভক্তি সবই হৃদয়ে আছে, কিন্তু রুঢ় বাস্তবতার চাপে তা প্রকাশ করার সুযোগ কম। সারা সপ্তা হারভাঁঙ্গা পরিশ্রমের পর সবাই হাফিয়ে উঠে। অনেকেই উপযুক্ত চাকুরী পায়না বলে হতশায় ভোগে। অডজবের পরিশ্রম বেশী, মাইনা কম। ফলে সব সময় কারনে অকারনে মন থাকে বিষিয়ে । তাই সবাই চায় ছুটির দিনগুলি মনের মাতো করে উপভোগ করতে । এদেশে কেউ কারো,তোয়াক্কা করে না, সবাই স্বাধীন। এখানে সবাই পয়সার বিনিময়ে কাছ করে সেটা সেবা যত্ন যে পর্যয়ে হউকনা কেন। নানা-নানী, দাদা-দাদী, নিজ নাতি-নাতনীদের দেখা শুনা করলে ও পয়সা দিতে হয়, কেউ হাত খরচ হিসাবে দেয় কেউবা প্রাপ্য মুজুরী হিসাবে দেয় যার যা রুচি । কারন শ্রমের তো একটা মূল্য আছে? দেশের সামাজিক বন্ধনের সাথে এখানে এসব মিলাতে গেলেই শুধু সুখ ও বেদনা আর হতাশাকে বরন করে নিতে হবে। বলতে দিধা নেই অনেকে সন্তানদের ভবিষতের কথা চিন্তা করে দেশের সুখ স্বাচ্ছন্দ অর্থ সম্পদ, লোভনীয় চাকরির মায়া ত্যাগ করে বিদেশ পারি দেয়। নুতন স্থানে নতুন করে জীবন সংগ্রাম শুরু করেত হয়। প্রতিযোগিতার এদেশে কাংক্ষিত চাকুরি বা প্রতিষ্ঠা কেউ পায়, কেউ পায়না । অনেক সন্তানদের ভবিষৎ নিরাপদময় করে তোলার জন্য সম্পদ রেখে যায়, অনেক আবার শেষ বয়সে নিজেদের জীবন-সুখ-শান্তি আরাম-আয়েশ ও নির্ঝঞ্ঝাট করে তোলার জন্য সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে, কিন্তু কতজনের ভাগ্য সুখের পায়রার মতো পত পত করে ওড়ে তা ভাববার বিষয়। সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পিতা মাতা সর্বাত্নক প্রচেষ্ঠা চালায়। মনে একটি সুপ্ত বাসনা থাকে আজ যেমন এদের মানুষ করতে সর্বস্ব ত্যাগ করছি এরাও একদিন শেষ বয়সে আমাদের সেবা যত্ন করবে। বালাবাহুল সংসারের হাসি কান্না প্রেম ভাল বাসা জগড়া বিবাদ অভাব অনাটন ইত্যাদি থাকেবে। কিন্তু সমস্য হয় তখন যখন ক্ষুদ্র বিবাদ নিয়ে অবিশ্বাস্য দানা বেধে উঠে এবং ক্রমান্বয়ে সে অবিশ্বাস বা সন্দেহ স্থায়ী ঘৃনায়রুপ নেয় তখন বিচ্ছেদের হাওয়া খুব দ্রুত বহতে থাকে। জীবন নিরানন্দ ময় হয়ে পড়ে, বেঁচে থাকার সাধ মরে যায় অন্তরে। এদেশে শিশুরা স্কুলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত দাদী নানীর কোল ঘেসে থাকতে নিরাপদ মনে করে, কারন বাবা মা সে সময়ে কাজে থাকে। তারপর স্কুলে যাওয়ার পর থেকেই নিত্যনুতনের সাথে পরিচিতি হতে হতে ক্রমান্বয়ে এ দূরত্ব বাড়াতে থাকে। কে আর পারতো পক্ষে পুরাতনকে আকড়ে থাকতে চায়। হয়তঃ একসময় জীবনের শেষ প্রন্তে পৌঁছে হাতরে বেড়ায় পুরানো স্মৃতিকে । যেমন আজও ভুলতে পারিনা হারনো সে দিনের কথা। সব ভাইবোন মিলে জোৎস্নার রাতে উঠানে মাদুর বিছিয়ে ঠাকুরমার কোল ঘেষে শুয়ে রাক্ষস-খোক্ষস, রাজা-রানীদের গল্প শুনে কতো রোমাঞ্চিত হয়েছি। ঠাকুরমা নিত্য নতুন মজার মজার গল্প বলতেন আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতাম। মাঝে মাঝে ভাবে বিভোর হয়ে যাই, ছেলেবেলার কথা মনে হলে তখন মনের গহিনে সুর বেজে ওঠেঃ- ছেলে বেলার গল্প শোনার দিনগুলি মোর এখন কতো দুরে, আর আসেনা রাজার কুমার, পঙ্খীরাজে চড়ে।

দেশের কথা না হয় বাদই দিলাম। এ বিদেশে ঠাকুরমার ঝুলিতে যতই রাজা-রানী, রাক্ষস-খোক্ষসের গল্পই থাকনা কেন, ইংলিশস্থানে ইংলিশপড়ুয়া নতিপুতিদের কাছে সবই বৃথা, তবে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয় ইংরেজী জানা নানা নানীর। হয়ত সে আসা মেটাতে পারেন। নাতিপুতিরা ঠাকুরমার গল্পশুনে যতনা রোমাঞ্চিত হয়, তার চেয়ে বেশী হয় টিভিতে কাটুন দেখে । ভাষাগত কারনেই অনেক সময় দুরত্ব সৃষ্টি হয় । শিশুরা বেশীক্ষন সময় ইংরেজী ভাষার পরিমন্ডলে থাকে। ঘরে যদি নিয়মিতি বাংলাভাষার চর্চা না হয়, তবে সন্তানরা মার্তৃভাষা ভুলে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। পিতা মাতার যদি প্রচন্ড ইচ্ছা শক্তি থাকে তবে হয়ত ধরে রাখা সম্ভব। অনেক ছেলে মেয়েরা সহজে বাংলা বলতে চায়না, কারন তাদের চর্চা নেই, হয়ত বোঝে, কিন্তু গুছিয়ে বলতে লজ্জাবোধ করে। ফলে টিভির কাটুন ও ভিডিও গেমের উপর ঝুকে পড়ে। এসমস্ত নেশা অনেক সময় তাদের নাওয়া খাওয়া ও ভুলিয়ে দেয়। তবে শিশুরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, এদেশী আদব কায়দা শিক্ষার জন্য, তাদের প্রফেশন্যাল বেবীসিটার বা চাইল্ড কেয়ারে রাখাই শ্রেয়।

বুড়া বুড়ি হলে কিন্তু অনেক দোষ। দীর্ঘ জীবনের নানা অভিজ্ঞতা মাথার মধ্যে সারাক্ষন কিলবিল কিলবিল করতে থাকে। সংসারে কোন অনিয়ম হলেই জ্ঞান দেওয়া চাই। তদুপরি বয়সের সাথে সাথে জ্ঞান লোপ পায়, শ্রবন শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, ধৈর্য ক্ষমতা, মনের জোড়, দৈহিক শক্তিগুলো কমে যায়। এরমধ্যে সন্তানদের বদৌলতে যদি অল্প শিক্ষিত পিতা মাতারা গ্রাম থেকে আসেন তবেতো কথাই নেই । কোনমতেই প্রাচীন প্রথাকে তারা ছাড়বেন না, যতই কুসংস্কার বলে তাদের গালমন্দ করা হউক না কেন। অনেক আধুনীক সরঞ্জাম ব্যবহারে সহজে অভ্যস্থ হতে পারবেনা, ফলে সব কিছু এলোমেলো নোংড়া করে দেয়। তিরস্কার বা বুঝলেও কাজ হয়না। এদেশের সামাজিক রীতিনীতি সাথে খাপ খাওয়াতে বেগ পেতে হয়। ফলে পরিচিতিজন বা স্বল্প পরিচিতিদের পার্টিতে বা কোন স্থানে দেখা সাক্ষাত হলেই মনের কথাগুলো সরলভাবে অকপটে বলে ফেলে। কোন কোন সময় কোনে বিবেচনা না করে মনের অব্যক্ত কথাগুলো বলে একটু হাল্কা হতে চায়। কিন্তু আপনজনেরা যখন সে কথোপকন শুনে ফেলে, তারা ভীষন বিরক্ত ও বিব্রত বোধ করে। কথাগুলো এককান দুকান হয়ে তিল থেকে তাল হয়ে আপনজনদের কাছে ফিরে। আসে তাদের ও সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। ফলে বিভিন্ন পাটিতে এদের নিতে সংকোচ বোধ করে। এজন্য অনেক বুড়াবুড়ি প্রচন্ড শীতকে যতটুকু না ভয় পায়, নানা কারনে নিঃসঙ্গ হয়ে ভয়ে দেশে ফিরে গিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচে । শত প্রলোভনে এদের আর ফিরিয়ে আনা যায়না । জীবন

একটু বৈচিত্র আনতে হলে পাটি বা গেটটুগেদারের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। তবে ঘন ঘন পাটিতে যারা অভ্যস্থ, তাদের মনের খোরাক যদি ও মেলে কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, এতে সন্তানরদের পড়া শুনার ভীষন ক্ষতি হয় এবং ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে হতে, প্রতিযোগীতায় টিকতে না পেরে একদিন ছিটকে দুরে সরে যায়। পিতা মাতার লালিত স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। ভাবতে হবে অধিক রাত অবাধ পাটিতে সন্তানরা কি শিখছে?

বৃদ্ধাকে আমার এক বন্ধু বললো, এত যখন অশান্তি আন্টি দেশে ফিরে না গিয়ে "হোমে চলে যান না কেন?" বৃদ্ধা যেন আৎকে উঠলেন না বাবা না আমার দেশই ভাল। বাকী কাটাদিন সৃষ্টি কর্তার উপর সপে দিয়ে পার করে দিতে চাই। বলাবাহুল্য 'হোমে' সব ধরনের সুবন্দোবস্থ আছে । টিভি রুম, লাইব্রেরী খেলাধুলা ও ব্যয়ামের নানা আধুনীক সরঞ্জাম। থাকা খাওয়ার ও চিকিৎসার মতো মৌলিক অধিকার । নিয়মিতি সেবা যত্নের জন্য সাবর্ক্ষনিক অভিজ্ঞ ও পেশাদার লোক নিয়োজিত থাকে । সরকারী সংস্থাগুলির পাশাপাশি অনেক প্রাইভেট সংস্থা ও বৃদ্ধ বৃদ্ধা গৃহহীন নিঃস্ব নির্যাতিত মানুষের জন্য বিনামূল্যে সব ধরনের ব্যবস্থা করে থাকে। একজন মানুষ হিসাবে 'হোমে' যেমন মর্যাদা, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, সেবা যত্ন আছে, তেমনি আছে অবসাদ, বিষন্নতাময় এক নিঃষঙ্গ জীবন। কেবল নেই প্রিয়জনের স্নেহের স্পশ নিবিড় সান্নিধ্য, আকৃত্রিম ভালবাসা, শ্রদ্ধা ভক্তি আপন জনদের ঘিরে একত্রে বসবাসের মত 'স্বর্গসুখে' বাঙ্গালী বাবা-মা 'হোমে' চলে গেছেন শুনতে খারাপ লাগে। সমাজে পরিচিত মহলে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। কারন আজও আমাদের সমাজে প্রিয় সন্তান ও আপনজনদের শিকড় ছিন্ন করে, 'হোমে' আশ্রয় নেওয়াতে অভ্যস্থ হয়ে উঠেনি। আজও অনেক নির্মম ব্যবহার, অবহেলা, অশ্রদ্ধা, অপবাদ, নির্যাতন সহ্য করেও স্নেহের সন্তানদের আকড়ে থাকতে চায়। অনেক সময় তাদের হৃদয় গুমড়ে কেঁদে উঠে, কেউ সহ্য করতে না পেরে প্রকাশ করে দেয়, কেউ দেয়না নিরবে হযম করে যায়। তবুও ভাগ্য ভাল, উন্নত দেশগুলিতে 'হোমের' ব্যবস্থা আছে। একঘর ভাঙ্গালেও আরেক ঘর পাওয়া নিশ্চিত। কিন্তু আমাদের দেশেতো সে সুযোগও নেই। বৃদ্ধার সঙ্গে অনেকক্ষন কথা বলেছি ঠিকই কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়নি তিনি সধবা না বিধবা । যদি বিধবা হন, তবে কিভাবে জীবন অতিবাহিত করবেন? কোন পিতা-মাতাই পারতপক্ষে, অবাধ্য সন্তানদের অভিশাপে দেননা বরং তাদের মঙ্গলের জন্য, মহান ঈশ্বরের চরনে প্রতিনিয়তি প্রার্থনা করেন। বৃদ্ধাও একবার তার সন্তানের অমঁঙ্গল কামনা করেননি বরং বারাবার বলেছেন, ওড়া ভাল থাকুক, সুখে থাকুক। যারা দৃশ্য পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি, ভালবাসা, সেবা-যত্ন করতে পারেনা তারা, অদৃশ্য পিতা মাতাকে কিভাবে শ্রদ্ধা-ভক্তি, সম্মান দেখাবে তারা। প্রভু য়ীশুখ্রীষ্ট একবার তাঁর প্রিয় শিষ্যদের বলেছিলেন, যারা এখন আমাকে ও আমার শিক্ষাকে মেনে নিতে লজ্জা পায়, মানবপুত্র যখন সমহিমায় পিতার ও পবিত্র দুতদের মহিমার মন্ডিত হয়ে আসবেন তখন তিনি ওতাদের স্বীকৃতি দিতে লজ্জা পাবেন । (লুক ৯-২৬ পদ) বলাবাহুল্য, সবাই একদিন বুড়া বুড়ি হবে, কেউ পৃথিবীতে চিরদিন থাকবে না। আমরা যারা বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে যোগ্য সম্মান দিতে পরিনা, তারা যখন এ পৃথিবীতে থাকবেন না আমাদের কৃতকর্মের জন্য তখন যদি অনুতপ্ত হয়ে, তাঁদের বিদেহী আত্মার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাঁদের আত্মারা হয়ত বলবেন, "কে তোমরা? আমি তোমাদের চিনিনা।"

নিউইয়র্কে মারীয়ার সেনাসংঘের মা-মারীয়ার জন্মোৎসব উদ্‌যাপন এবং বাৎসরিক পিকনিক

মারীয়া রোজারিওঃ বিগত ৮ই সেপ্টেম্বর ২০০৬ সন - সন্ধ্যা ৭:৩০ ঘটিকায় নিউইয়র্ক - ম্যানহাটানে সেনাসংঘী চিত্রা রোজারিওর বাসভবনে মারীয়ার সেনাসংঘের স্বর্গে রানীর প্রেসিডিয়মের সেনাসংঘীগণ মা-মারীয়ার জন্মোৎসব পালন করেন। এই উপলক্ষ্যে সংঘের প্রেসিডেন্ট ছিরিল ডি. রোজারিও, ভাইস প্রেসিডেন্ট ছাইমন রোজারিও জন্মদিনের কেক কেটে মা মারীয়ার জন্মতিথি সূচনা করেন এবং উপস্থিত সবাই মা-মারীয়ার জয়ধ্বণি করেন। কেক কাটার পূর্বে সংঘের প্রেসিডেন্ট ছিরিল ডি রোজারিও সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন কেন আজ আমরা মা-মারীয়ার জন্মতিথি পালন করতে যাচ্ছি? কারণ তিনি হলেন সেনা সংঘের প্রধান সেনাপতি আর আমরা হলাম তাঁর সৈনিক, তিনি হলেন অদ্বিতীয়, নিস্কলংক নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরই তাঁর স্থান। সূতরাং মা-মারীয়া সাধারণ নারী নন - অসাধারণ যা আমাদের কল্পনার বাইরে। সেই জন্যই শাস্ত্রে বলে - এক নারী (হবা) পৃথিবীতে পাপ আনয়ন করেছেন - আর এক নারী (মা-মারীয়া) জগতে পাপের বন্ধন থেকে পরিত্রাণের পথ সুগম করে তোলেন। কারণ পিতাপরমেশ্বর-এর একমাত্র পূত্র প্রভূযীশুও এ জগতে এসেছেন মা-মারীয়ার গর্ভে মানব জাতির মুক্তিদাতা রূপে। মা-মারীয়া যদি স্বর্গদূতের কথায় 'মা হবার' সম্মতি না দিতেন, তবে প্রভু যীশুও এ জগতে আসতেন না। আমরাও খ্রীস্টান নাম ধারণ করার সুযোগ পেতাম না। সুতরাং মা-মারীয়ার মহান আত্মত্যাগের জন্যই আজ আমরা খ্রীস্টান হিসেবে পরিচয় দিচ্ছি। প্রতিটি পরিবারে এবং জগতে শান্তি নেমে আসুক - ইহাই হবে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা মা - মারীয়ার জন্মতিথিতে।

পিকনিকঃ

বিগত ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০০৬ সন - সোনাসংঘের সহচর অনুসারে আমরা স্বর্গে রাণীর প্রেসিডিউমের সকল সদস্য-সদস্যা গণ বাৎসরিক পিকনিক করার জন্য ফ্রান্সিস কেব্রিনী তীর্থস্থানে গমন করি। ইহা নিউইয়র্কের আপটাউনে পাহাড়ের উপর অবস্থিত ১৯৬ স্ট্রিট -এর বিরাট গির্জা। সেই গীর্জায় বেদীর সামনে আয়নায় কাচ কেটে অবস্থিত সেন্ট ফ্রান্সিস কেব্রনীর একটি শায়িত মুর্তি। যেহেতু ইহা একটি তীর্থস্থান, সেইহেতু এখানে অনবরত ভক্তগণ আসছে। সেই জন্যই গীর্জার চারিপার্শ্বে বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে। একটু দুরে দোকান-পাঠও আছে। খাওয়া দাওয়ার কোন অসুবিধা নেই। তীর্থ করা এবং পাহাড়ের উপর পিকনিক করার ইহা একটি উৎকৃষ্ট স্থান। সেই জন্যই আমরা মারীয়ার সেনাসংঘের পিকনিক করতে ওখানে গিয়েছি। বর্তমানে আমাদের সেনাসংঘীর সংখ্যা হল ১১জন। তারা হলেন - ছিরিল ডি রোজারিও- প্রেসিডেন্ট, ছাইমন রোজারিও-ভাইস প্রেসিডেন্ট, মারীয়া রোজারিও - সেক্রেটারী, ডমেনিক মৃঃ - সহ. সেক্রেটারী, তা ছাড়া সাধারণ সদস্য - সদস্যা - উইলিয়াম গমেজ, মার্থা গমেজ, শিশিলিয়া গমেজ, চিত্রা রোজারিও, ডেরিক গনছালভেস, প্রভা গনছালভেস, এবং প্রেমানন্দ হাজরা। বিভিন্ন এলাকায় আরো সেনাসংঘ গড়ে উঠুক - ইহাই আমাদের একান্ত কাম্য।

মনের সাথে বিবেকের যুদ্ধ

ভ্যালেন্টিনা অপর্ণা গমেজ, *টরেন্টো, কানাডা*

সময়গুলো খুব দ্রুত দৌড়ায় জীবন থেকে। পাওয়া না পাওয়ার কষ্টগুলো নিরন্তরই বুকের ভেতর গর্ত খুঁড়েই চলে। অদিতির অনুভবে আজ বেঁচে আছে কিছু পুরনো স্মৃতি যা পোড়া কাগজের ছেড়া টুকরো, অযথাই আকঁড়ে ধরে থাকা। সংসার চলছে তার আপন নিয়মে। দায়বদ্ধ হয়ে দায়িত্বগুলো পালন করে যাচ্ছে অদিতি। এর মাঝে কোথাও সুখ বলে কিছু নেই। অথচ সুখের জন্যই তার অনেক ভুল। দোলা তার আগের ঘরের সন্তান। ডিম্পল তার দু'মাসের সন্তান দ্বিতীয় ঘরের। দোলা মাঝে মাঝেই কিছু উদ্ভট প্রশ্ন করে বসে। অদিতি তার নিজের জীবনের হাজারো প্রশ্নের মুখোমুখি থেকে নিজেকে এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু দোলা তার ক্ষতগুলোর মাঝে নিড়ানী দেয়। দোলার কোন দোষ নেই, অবুঝ শিশুমনে প্রশ্ন জাগতেই পারে যেখানে তার বাবা তাকে এত ভালবাসে। প্রতি সপ্তাহে তাকে ফোন করে, অন্তত মাসে একবার তাকে দেখার আকুলতায় কাজ ফেলে ছুটে আসে। প্রদীপের সাথে অদিতির পাঁচটি বছরের সংসার, বিয়ের আগের তিনবছরের যোগাযোগ। কতইনা আনন্দের ছিল তাদের সেই দিনগুলো। মাঝে অদিতির কি হল। সে সব যেন কাঁচের টুকরোর মত ভেঙ্গে গেল। আজ অদিতি অনুভব করতে পারে হয়ত ভুলটা তারই ছিল। অতটা জেদ করাটা তার উচিত ছিলনা। তাই দোলার মনে অনেক প্রশ্নের উদয় হয় যার উত্তর অদিতি দিতে পারেনা। প্রদীপ আর বিয়ে করেনি। অদিতি নতুন করে সংসার গড়েছে প্রনবের সাথে। প্রনব বিবাহিত ছিল। তার স্ত্রী আমেরিকায় বয়ফ্রেন্ডের সাথে চলে গেছে। প্রনব অদিতিকে অন্যান্য স্বামীদের মতই স্বাভাবিক ভাবে তার জীবনে গ্রহন করেছে। ভালবাসায় কোন কমতি নেই। কিন্তু অদিতিই পারছেনা পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে। দোলাকে প্রনব নিজের মেয়ে বলেই মানে, কিন্তু দোলা তাকে বাবা বলে ডাকে না, তার কথা "আমার বাবা একজনই।"

অদিতির ভাবনা দোলা বড় হচ্ছে। সামনের দিনগুলোতে সে দোলাকে সঠিক ভাবে গাইড দিতে পারবে কি? তার সব সময় একটা ভয় তার জীবনের ভূল গুলো যদি দোলার হৃদয় ছায়া ফেলে তখন কি হবে। এসব ভাবনা সারাক্ষনই তাকে বিচলিত করে। হঠাৎ ডিম্পলের কান্না শুনে অদিতি ছুটে যায় পাশের ঘরে। কাগজের মেয়েটা কোলে নিয়ে সালমার চেষ্টা করছে। অদিতি ডিম্পলের ফিডার আনতে যায়। রান্নার কাজ সব অদিতি নিজের হাতেই করে বাচ্চাটা কে সামলাতে কাজের মেয়েটাকে রেখেছে। বিকালে প্রনব কাজ থেকে ঘরে ফেরে। প্রনব অদিতিকে হাসিখুশি রাখার চেষ্টা করে মাঝে মাঝে বাচ্চাদের নিয়ে পার্কেও বেড়াতেই যায়। আবার কখনও চাইনিজ খেতে রেস্টুরেন্টে যায়। অদিতি প্রায়শই আনমনা থাকে, প্রনব বিরক্ত হয়না। অদিতি তার গড়া নিরব জগতে ডুবে থাকতে পছন্দ করে। অথচ এমনটি সে কখনই ছিলনা । প্রদীপের সাথে যখন ছিল, তখন সে অনর্গল কথা বলত, তার কথা শুনতে শুনতে প্রদীপের কান গরম হয়ে যেত তবু অদিতি ক্লান্ত হতনা । সেই অদিতি আজ কেমন নিরব হয়ে গেছে। প্রদীপের ভালবাসা আজ অবধি অদিতির হৃদয়কে স্পর্শ করে। তাই সে প্রবনকে মনপ্রান দিয়ে ভালবাসতে পারে না স্ত্রী হিসাবে। অদিতির কাছেও প্রনবের সাধারন কিছু প্রত্যাশা থাকলেও প্রনব তা পায়না। তারপরও প্রনব কখনও অদিতিকে হার্ট করে না। তার বিশ্বাস একদিন তার ভালবাসা তার কছেই ধরা দেবে।

অদিতি ডিপ্পলকে ঘুম পারিয়ে দেয়। রান্নার কাজ শেষ করে দোলাকে স্কুলে থেকে আনতে যায়। আজ স্কুলে যাওয়ার পথে হঠাৎ নির্ঝরের সাথে দেখা । নির্ঝর অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়েঃ তুমি অদিতি না?

ঃ আরে নির্ঝরদা, কতদিন পর দেখা। কোথায় ছিলে এত বছর?

ঃ আগে তোমার কথা বলো, প্রদীপ কেমন আছে? শুনেছিলাম তোমাদের একটি মেয়েও নাকি হয়েছে। কিন্তু তোমার চেহারার দশা দেখে মনে হচ্ছে প্রদীপের ভালবাসার স্বপ্ন সাগরে নয় তুমি তো মরুভূমির শুকনো বালি থেকে উঠে এসেছ। একি হয়েছে তোমার চেহারা। বিধাবাদের মত গলা খালি, কান খালি। হোয়াটস রং?

নির্ঝর একাধারে এতগুলো প্রশ্ন করে বসে, অদিতি কি জবাব দেবে? তার নিরবতার ব্যখ্যা নির্ঝরকে কয়েক মিনিটের মধ্যে বোঝানো সম্ভব নয়। আর যেহেতু এত লোকের ভিড়ে রাস্তায় দাড়িয়ে তো নয়ই।

ঃ নির্ঝরদা তুমি বাসায় এসো তবে ৩৬ নম্বর ধানমন্ডিতে নয় আমি এখন বাসা বদল করেছি।

অদিতি খুব তাড়াহুড়ো করে ব্যাগ থেকে একটুকরো কাগজ বের করে ফোন নাম্বারটা লিখে দিল। নির্ঝর হাতে নিয়ে বলল-

ঃ ঠিকানা তো দিলেনা। আচ্ছা যাক ফোনে কথা বলে না হয় ঠিকানা নিয়ে নেব। আর হ্যা প্রদীপকে বলো নির্ঝর দেশে ফিরেছে, বাদরটার সাথে অবশ্যই দেখা করব।

অদিতি আর কথা বাড়ালনা। নির্ঝর প্রদীপের এক সময়ের খুব ভাল বন্ধু। যোগাযোগে নেই বরে নির্ঝর সেই আগের মতই কথা বলেছে। স্কুলে কাছে পৌঁছুতেই দোলা ছুটে আসে। ওর হাতে কোন আইসক্রীম।

ঃ মা তুমি এত দেরী করলে কেন। জান সেই কখন থেকে আমি অপেক্ষা করছি।

ঃ একটু দেরী হল তোমার এক আংকেলের সাথে দেখা হল তাই। তুমি আইসক্রীম কোথায় পেলে? আমিতো তোমাকে টিফিনের জন্য টাকা দেইনি।

দোলা প্রথমে মাথা নীচু করে থাকে, অদিতি আবার জিজ্ঞেস করে।

ঃ মা আজ পাপা এসেছিল। আজ মাসেরে ১ তারিখ, তুমি ভূলে গেছ? পাপা আজ অনেকক্ষন অপেক্ষা করেছিল, তুমি অসতে দেরী করলে।

অদিতি দোলার কথাটাকে আমল না দিয়ে স্কুলের ব্যগটা তুলে নিল। ঘরিতে চোখ বুলেয়ে, ঝটপট হাটা দিল। ঠিক এভাবেই অদিতির জীবনের এক একটি দিন যেন একেকটি ভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেয় তাকে। তাই স্বাভাবিক জীবনে নিজেকে মানিয়ে নেয়া ভীষন অসাধ্য হয়ে পরে। এ অনুভূতি কাউকে বলার নয়, বোঝানোর নয়। দোলা আজ অনেক খুশী। মাসের একটি দিন যে অধির আগ্রহে অপেক্ষা করে। দোলার খুশী দেখে অদিতির মনে হয় ঠিক ওর মত করে যদি একটি দিনও তার জীবনের এমন উচ্ছলতা বয়ে আনত।--

নিজের মনে নিজেই হেসে ওঠে, কি সব ছেলেমানুসী চিন্তা তার মনের কোনে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। দোলা কাপড় পাল্টে কাঁধে তোয়ালে চেপে স্নানঘরে ঢুকলো। অদিতি ডিপ্পলকে স্নান করাল। ঘড়ির কাটা ঢং ঢং বেজে উঠল। পেছন দিকে তাকাতেই দেখল প্রনব এসেছে।

ঃ আজ একটু তাড়াতাড়ি এলাম। তেমন কাজ ও ছিলনা। অদিতি চলো আজ আমরা দোলার নানু বাড়ি যাই। বিকেলের বাসটা ধরলে সন্ধ্যের আগে আগেই পৌঁছে যাব।

ঃ তোমার না ডিউটি।

ঃ আরে ম্যানেজারকে বলে ২ দিনের ছুটি নিয়েছি। দোলারও স্কুল বন্ধ। সহজে তো ছুটি মেলেনা। তাছাড়া দোলার নানু কবে থেকে বলছে, তুমিও তো কতদিন ধরে যাচ্ছনা।

কথাটা শুনে অদিতি একটু খুশী হবে ঠিক এরকমই ভেবেছিল প্রনব। অদিতির এই সাধারন আচরনগুলো প্রনব আশা করে কিন্তু অদিতি তা করেনা। তাই দাম্পত্য জীবনটা ক্রমশই যন্ত্রের মত হয়ে যাচ্ছে। অদিতি কারো সাথেই সেয়ার করছেনা। তবে প্রনব এবার ভাবছে বিষয়টি সে শাশুরীকে জানাবে। অদিতির মা খুব বুদ্ধিমতি এবং খোলা মনে কথা বলতে পছন্দ করেন। হয়ত অদিতির সমস্যটা তার মা কিছুটা হলেও বুঝতে পারবেন। খাবার টেবিলে প্রনব দোলাকে কাছে ডেকে বলে, আমরা বিকেলে নানু বাড়ি যাচ্ছি। দোলা তো মহাখুশী, কতদিন পর নানু বাড়ি যাবে। দোলার খুশী দেখে প্রনবের ভাল লাগল। দোলার হৃদয়ে স্থান করে নেয়ার লোভটা প্রনব মাঝে মাঝে সামলাতে পারেনা তাই সে তার মুখে পাপা ডাক শোনার আকাঙ্খা করে। প্রতিদিনের মত আজ দোলাকে বার বার বলতে হয়না, তাড়াতাড়ি খাবার খাও। সে নিজেই ব্যস্ত হয়ে পরে তার ব্যাগ গুছাতে। অদিতি খাবার শেষে সবগুছিয়ে, বাড়তি

খাবার গুলো কাজের মেয়েটাকে দিয়ে দিল। আর তারও ২ দিন ছুটি দিল। কাজের মেয়েও খুব খুশী। অদিতির খুশীটা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই।

বিকেল পাঁচটার গাড়িতে সবাই গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হল। তিন ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে গেল অদিতির বাপের বাড়ি। অদিতিকে দেখে তার মা যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলনা। দোলাকে জড়িয়ে ধরে কি যে খুশী হলেন তিনি। মেয়ে জামাইকে নিয়ে তার ব্যস্ততার যেন অন্ত নেই, কোথায় তার স্নানের জল, কোথায় কি! শাশুরীদের কাছে জামাইর কদরই আলাদা। অদিতি ডিম্পলকে খাইয়ে ঘুম পরিয়ে দিল। হঠাৎ বিজলীটাও চলে গেল। প্রচন্ড গরমে ঘরে টেকা সম্ভব হলনা, সবাই মিলে গল্প করিতে ছাদে উঠল। রাতে প্রনব শাশুরীর সাথে কথা বলার তেমন সুযোগ পেলনা তাছাড়া প্রথমদিন কথাগুলো বলবে সেটা যেন ঠিক উচিত হবে বলে মনে হলনা। পরের দিন ভোর বেলা অদিতির মা নিজের হাতে চিতোই পিঠা বানাতে ব্যস্ত হয়েছেন মেয়ে জামাইর জন্য। অদিতি ডিম্পলকে নিয়ে একটু বেলা পর্যন্ত শুয়ে রইল। প্রনব দাঁত ব্রাস করে, হাত মুখ ধুয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল। শাশুরী বসার টুল এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল-

এবার বলো বাবা আমার মেয়ে তোমার সংসারে সব মানিয়ে চলছে তো? তুমি সংকোচ কোরনা, আমি তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি হয়তো তুমি কিছু বলতে চাও। অদিতির চেখে মুখেও আমি সেই ছায়া দেখিনি।

প্রনবের কথা বলাটা যেন আরো সহজ হয়ে গেল শাশুরীর কথা শুনে।

অদিতির ব্যাপারে আমার কোন অভিযোগ নেই শুধু তুমি ওর সাথে খোলাখুলি কথা বলে একটু জানার চেষ্টা করো, আমি আর কি করলে ওর মুখে হাসী ফুটবে, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ওকে যেন ঠিক বুঝতে পারছিনা। ওর অতীত নিয়ে আমি কখনোই মাথা ঘামাইনা কিন্তু

ঃ প্রনব বাবা তুমি এতটুকু বলেছ, আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি চিন্তা কোরনা আমি ওকে বুঝিয়ে বলব।

এদিকে দোলা ব্রাস হতে করে ছুটে এসেছে রান্নাঘরে-

ঃ দিদিমা তুমি নাকি পিঠা বানাচ্ছ। কি মজা! আমি শীগগীর মুখ ধুয়ে আসি।

ঃ আমার পাগলী নানু ভাই! মা কি উঠেছে? ডেকে তোল, গরম গরম না খেলে স্বাদ পাবেনা।

অদিতি ইতিমধ্যেই উঠে গেছে বিছানা থেকে। প্রনবের কোলে ডিম্পলকে রেখে সে বাথরুমে গেল। দোলা তো হৈ হৈ চেঁচামেচিতে সারা বাড়ি গরম করে ফেলেছে। শহরের দমবন্ধ একটা রুমে দৌড়ঝাপ করার স্বাধীনতা না থাকায় আজকাল শিশুদের উৎসাহ-উদ্দীপনার শিকড়গুলো যেন শুকিয়ে যায়। দোলাকে এতটা উছুল দেখে মনে হচ্ছে প্রকৃতির খোলা বাতাসে আর উম্মক্ত আকাশের নীচে ওর ডানা মেলে ধরেছে। অদিতির মাও ভিষন খুশী কতদিন পর বাড়িটাতে সোরগোল। বেলা দশটা বাজতেই রান্নার ব্যস্ততা আরম্ভ হয়ে গেল তার। পাশের বাড়ির ঠাকুরমা নাত জামাইর আসার খবর শুনে খবর পাঠিয়েছেন দেখা করতে। প্রনব হাটতে হাটতে ডিম্পলকে কোলে করে তাকে দেখতে গেল। অদিতিও মায়ের সাথে সহযোগিতা করতে রান্নাঘরে গেল। অদিতিকে প্রশ্ন করল

ঃ এবার তো অনেকদিন পর গ্রামে এলি, তুই জামাইকে বলেছিস? নাকি জামাই তোকে নিয়ে এসেছে।

ঃ তোমার জামাই ই বলেছে। ওতো সব সময়ই আসতে বলে।

ঃ প্রনবের সাথে তুই ভাল আছিস? না মানে আমি জানতে চাইছি ওর সাথে তুই মনখুলে সব সেয়ার করিস।

অদিতি প্রশ্নটা এরিয়ে যেতে চাইলো। কিন্তু মা তার কথা বলেই চলল

ঃ দেখরে মা মেয়েদের জীবনে সুখ বার বার আসে না, সুখকে কেউ পায়ে ঠেললে কপালে অলক্ষী লাগতেও সময় লাগেনা। প্রদীপের সাথে তোর যা কিছুই ঘটেছে তাতে সংসার ভাঙ্গার মত কারন ছিল না। তোর মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তোকে রুখিনি কিন্তু আমি জানি দোষটা তোরই ছিলো। প্রদীপ বেচারা নির্দোষেই কষ্ট পেয়েছে। তারপর তোর জীবনের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে আমি অমত করিনি, প্রনব ভাল ছেলে। সে তোকে সুখী করার আপ্রান চেষ্টা করছে কিন্তু পারস্পরিক বন্ধন একক ভাবে আন্তরীক কখনই হয়না, যদি দু'জনের ভালবাসা এক না হয়, ইচ্ছা এক না হয়। প্রথমবার ভূল করেছিস এবার সেটা শোধাবার চেষ্টা কর। তোকে অতীত ভূলে গিয়ে বর্তমানকে আপন করার চেষ্টা করতে হবে। দোলাকেও সঠিক আদর্শ দেখাতে হবে তা না হলে সবই হারাতে হবে। আমি দোলাকে বোঝাব, প্রনব ওর বাবা। প্রনবের অধিকার প্রনবকে দিতে হবে। আর সেটা তোকেই করতে হবে।

অদিতি চুপচাপ মায়ের কথাগুলো শুনল। সে নিজেও রিয়ালাইজ করছে অনেককিছু কিন্তু কোথায় থেকে আবার নতুন করে ভাবা যায় সে ব্যাপারে সে কনফিউজ। প্রনবের স্বাভাবিক চাওয়া পাওয়ার ব্যাপারগুলো সে বোঝে অথচ সে নিজেই স্বাভাবিক ভাবে নিজেকে তুলে ধরতে পারেনা। প্রদীপের চেহারাটা তার সামনে দর্পন হয়ে দাঁড়ায়। বার বার তার বিবেক তাকে স্মরন করায়, সে ধোকা দিয়েছে প্রদীপকে, প্রদীপের ভালবাসাকে অবজ্ঞা করে আজ আন্তপ্রবঞ্চকের মত জীবন সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আবার নতুন করে ধোকা দিচ্ছে প্রনবকে, তাকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। যতবার সে আয়নার সামনে দাঁড়ায় তার কেবলই মনে হয় - প্রতারনার মুখোশ তার মুখাবয়বে। না পারছে নিজেকে ক্ষমা করতে, না পারছে কাউকে সুখী করতে। অদিতি জানেনা এভাবে কতদিন সে নিজের সাথে যুদ্ধ করবে, কবে শেষ হবে তার এ যুদ্ধ। মাঝে মাঝে সে মনে করে এটা তার শাস্তি। প্রতিক্ষনে তিল তিল করে পাওয়া এ শাস্তি তাকে সরাসরি কেউ দিচ্ছে না, যে দিচ্ছে সেটা তার বিবেক। অদিতির উপর নির্ভর করছে দোলার ভবিষ্যত। সময় চলে যাচ্ছে, দোলার মনের ছোট ছোট প্রশ্নগুলো একদিন বড় হবে। সেদিন অদিতির জবাব দিতে হবে। তাই জীবন নদীর মাঝখানে থেকে সাঁতার কেটে তীরে তাকে পৌঁছতেই হবে। অদিতির মা অনেকভাবে, অনেকের জীবনের বাস্তবতা টেনে অদিতির প্রশ্নের সমাধান করতে, পথ দেখাতে চেষ্টা করলেন। অদিতির সাথে যারা ঘনিষ্টভাবে পরিচিত তাদেরও বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীনে হতে হয় তাকে। মায়ের সাথে কথা বলার পর অদিতির মনে হল এখনো সময় ফুরিয়ে যায়নি, সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। প্রনবের সাথে আর ধোকা নয়, নিজের সাথে আর যুদ্ধ করা নয়, দোলার মনের প্রশ্নকে আর এড়িয়ে যাওয়া নয়, এখন থেকে হবে সবকিছুর সম্মুখে নিজেকে উপস্থান করা।

লেখা আহ্বান

"তেপান্তরী" তে ছাপানোর জন্য আপনার লেখা গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ছড়া, উপন্যাস আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

PBCA P.O. Box 1258, NewYork NY 10159

প্রবাসীর তথ্য পেতে ভিজিট করুন

www.PBCAusa.org

আষাঢ়ী কন্যার অগ্নিস্নান

সূবর্ণা জাসিন্তা গমেজ, *জার্সি সিটি, নিউজার্সি*

কাল আষাঢ়ী কন্যার একটানা কান্নার জলে ভরে গেছে পথঘাট। ঘরের চালেও আর জল ধরছিল না। যেন গা ছেড়ে মেঘেদের কান্নার আসর বসেছে আকাশে। আজ ভোরে হালকা বৃষ্টির ফাঁকে অনেক কষ্টে দুহাতে মেঘেদের সরিয়ে উঁকি দিয়েছিল সূর্য। তারপর সেও একটা ঘোলাটে দিন উপহার দিয়ে আবার লুকিয়েছে মেঘের আড়ালে। আর বুঝি কিছু করার উপায় নেই তার। এদিকে বৃষ্টির জলে সিক্ত আউশের ধানগুলো ও পাগলা বাতাসের মাতলামী মাথানত করে বারবার প্রণাম করছে কাদামাটিকে। আর নিঃশব্দে বৃষ্টিকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাদায় জলে গা এলিয়ে দিয়েছে গরুর গাড়ীটি। কয়েকটা দিন আর ক্যাচ ক্যাচ শব্দে বহুদুর পথ চলতে হবেনা। দুই পুরুষে হাতের এই গাড়ীটিই এই বাড়ীর সকলের মুখে অন্ন তুলে দেয়। ভোর হলে নিবারনের সাথী হয় এই গাড়ী আর শিং বাঁকানো দুই বলদ। বৃদ্ধমা আর ছেলে নিয়ে দুবেলা খেয়ে কোনমতে বেঁচে আছে নিবারনের সংসার। বছর দুই আগে বউটা মারা গেছে অসুখে। নাম না জানা সেই অসুখের ঔষধ কেনার সাধ্য হয়নি নিবারনের। ছোট ভিটে মাটির ব্যাপক চাহিদা প্রতিদিন বিদ্ধ করে নিবারনকে। অভাবের তাড়নায় সমৃদ্ধির স্বপ্নে বিভোড় নিবারন রাজা হয় প্রতিরাতে সকালের রোদ কড়ানাড়ে স্বপ্নের দরজায়। ভেঙ্গে দেয় ঘুম স্বপ্নের প্রাসাদ। নতুন ঘর বাঁধার দারুন ইচ্ছাকে বুকে চেপে প্রতিদিন অভাবের প্রজা হয় নিবারন।

নিবারন ও নিবারন, উঠ বাপ। বেলা যাচ্ছে। এই বৃষ্টি নামবে না। কত যে বেলা হল কে জানে। বলদদুটোকে কিছু খেতে দে। গোপালকে নিয়ে গুড় মড়ি খেয়ে বারান্দায় বসে ছেঁড়া কাঁথায় রন্দিন সুতোর ফোঁড় দিতে লাগলো নিবাবনের মা। দাদী আমাকে একটা জাল কিনে দাওনা। খালের পানি ছুটেছে পাড়ার সব ছেলেরা ওখানে গিয়ে মাছ ধরে। আমি যাবো। দাও না কিনে একটা জাল। দাদীর গলা জড়িয়ে আবদার করলো গোপাল ।

নতুন জাল আমি পাবো কোথায় ভাই। মুড়ি বিক্রি করে একখানা পুরান জাল কিনে আনবোনে। তারপর দেখাবো তুমি কত মাছ ধরো। নদীর কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে আনন্দে খোলা বারান্দায় এককোনে বিড়ালকে আদর করে খানিকটা মুড়ি ছাড়িয়ে দিলো গোপাল। তাই দেখে প্রিয় কুকুর রাশা এসে ওর ভাগের জন্য লেজ নাড়াতে লাগলো ।

আমাকে কিছু খেতে দাওমা। যাই গিয়ে বলদাদুটো ছেড়ে দেই। মাঠে গিয়ে ঘাস খাক।

বলদছেড়ে কাজ নাই নিবারন । উত্তরের মাঠ জলে ভেসে গেছে। তুই বরং গাঞ্জে যা, মায়া ছাড়িয়ে এবার ওদের বিক্রিকরে একটা ভাল নাও কিনে আন । বর্ষা আসবে দেরী নাই এবার ঘাটের ঠিকা নিলে কয়টা মাস আর চিন্তা করতে হবে না । হাতের কাজ রেখে ছেলের কাছে এসে বসলো পঞ্চমী।

বলদ আমি বিক্রি করবো না মা। গঞ্জের পথে আর কদিন ক্ষ্যাপ দেই। তারপরে আমার ভাঙ্গা নৌকা ঠিক করে বর্ষাডা পার করবো ভাবছি। আমি যাই মা। দুপুর আজ বাড়ী আসবো না।

এই বাদলা দিনে কি আর ক্ষ্যাপ মিলবে। এই পুটলীতে চিড়া গুড় দিলাম। দুপুরে খেয়ে নিস বাপ। ভগমান যে কবে মুখ ফিরে তাকাবে। সরকার বাড়ীর ধানভানার কাজটা করলে কিন্তু পয়সা পেতাম নিবারন। আমাকে আর না করিস না।

এই বয়সে পরের বাড়ীতে কাজ করলে মানুষ কি বলবো মা আর দুটো মাস পরেই বন্দকী জমি ফিরে পাবো। বর্ষা গেলে নিজের জমিতে চাষ করবো। তখন আর অভাব থাকবে না মা। বেলা যাচ্ছে আমি যাই।

ছেঁড়া গামছা মাথায় বেঁধে গুড়িগুড়ি বৃষ্টিতে নিবারন গরুর গাড়ী নিয়ে ক্যাচ ক্যাচ শব্দে ঘাটের দিকে চললো। এই যা যা ডাইনে যা ডাইনে.....

নিবারনের মা যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখে গোপালকে। আচলের গিট খুলে দুপয়সার সন্দেশ কিনে দিয়ে স্বস্তিব নি:শ্বাস ফেলে প্রানভরে। যাটবছরের হাড়উঠা ভাঁজপরা শুকানো চামড়ার হাত ধরে দশ বছরের এক অবুঝ বালকের বেড়ে উঠা যেন বিদায়ী সূর্য়ের প্রভাতী আয়োজনের মতো। ..... শ্রেষ্ট দিনগুলির সাথী হয়ে ..... ভালবাসার ছোঁয়ায়। দারিদ্রের ঝড় ঝঞ্জয় কবলিত নিবারনের সংসারে কুটুম্বদের আসা যাওয়া তেমন নাই। জাতের ভেদাভেদে খেলার আসরে তাই গোপাল ও স্থান পেয়েছে সবার পিছনে। কখনো সাথীদের অবহেলায় পাত্র হয়ে মন খারাপ করে ফিরে এসেছে বাড়ীতে। তারপর ঝোপ জঙ্গলে ঘুরে বেরিয়েছে একা একা। রং বেরং এর ফাউং ধরে সুতোয় বেঁধে উড়িয়ে দিয়ে আকাশে, নীল বেগুনীর জংলীফুল তলে আনে দাদীর জন্য। একটার মুক্তার আশায় পুকুরপারে ঝিনুক ভেঙ্গে কাটিয়ে দেয় সারা দুপুর। তারপর শামুকের ডিম এনে খেতে দেয় পোষা পাখিরে। সন্ধ্যা হলে জোনাকীর আলোয় ভরিয়ে দেয় ভাঙ্গা বেড়ার ঘর। দাদী ও দাদী দেখে যাও পুকুর পারে মাছগুলো কেমন টুপটাপ করেছে। তাড়াতাড়ি আসো চলে যাবে তো .....

আরে ছেড়ে দে আমাকে। পা পিছলে পড়ে যাবোতো কাঁদায়। পাগল ছেলে -- আরে সবুর কর একটু। উঠান থেকে দাদীর হাত ধরে টেনে পুকুর পারে নিয়ে আসলো গোপাল। দেখো মাছগুলি ভেসে বেড়াচ্ছে। পরশু হাটে গেলে জাল পাওয়া যাবে। দাও না এনে। আরে এই কয়টা মাছ দেখে আস্থির হয়ে গেছো। আমার কাছে মাছের গল্প শুনলে তুমি তো বেহুশ হয়ে যাবে।

বলো না দাদী তোমার মাছের গল্পটা।

দুর বোকা এই দুপুর বেলা কাজকর্ম ফেলে গল্প বলে নাকি, রাতে চাঁদের আলোয় বসে তোমারে গল্প শোনাবোনে।

সেই রহস্যময় মাছের গল্প শোনার আশায় সারাদিন দাদীর বাধ্য হয়ে চলন গোপাল। মার্বেলের আসর থেকে সকলের চোখ এড়িয়ে ছয়খানা ভাঙ্গা মার্বেল তুলে এনেছিল গোপাল। সেই অমূল্য সম্পদ বের করে ঠুকাঠুকি খেলে একাই মাতিয়ে উঠালো সারা উঠান।

একপোয়া কেরোসিন দেতো ধবলা।

এই সাঝেঁর বেলা আর বাকী দিবনা নিবারনদা । তোমার আগের বাকীটাও জমা পড়ে আছে। আজ আর বাকী হবে না ।

তোর সব পাওনা আজ মিটিয়ে দিবো। নে ধর বোতলটা ভরে রাখ।

আরে কই চললে তুমি। দোকানে এসে বসো।

হুক্কার আগুন নিভে গেছে। মাঝির কাছে থেকে তামাক সাজি আনি। ধবলার দোকানের পাশে গরুর গাড়ী রেখে নদীর ঘাটে চললো নিবারন। মাঝি তখন পুরানো চাদরে সারাদিনে রোজগার ঢেলে হারিকেনের আলোয় গুনতে বসেছে।

দয়াল মাঝির খবর কি? দিনকাল ভাল তো? -

আমার আর ভালমন্দ। শুনছো না পাশের গায়ে যাত্রা হচ্ছে। গাঁয়ের ছেলেপুলে দুপুর রাতে বাড়ী ফিরে। ওপার থেকে ডাকাডাকি করে। নদী পার করে দেই। কিন্তু কেউ পয়সা দেয়না নিবারন। আমি বুড়া মানুষ। কিন্তু বলতে গেলে উল্টা গালাগালি করে। মনটা ভাল নাই নিবারন। ছেলেরা একরকম আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ী থেকে। ঘাটে নৌকা বাই। চোখে ও তেমন দেখি না এখন। খুব কষ্টে আছি নিবারন। বড় কষ্টে বেঁচে আছি আমি। ভগবান ডাকলে মুক্তি পেতাম.....। আমি এসে আপনার মনডা খারাপ করে দিলাম। চখে মোছেন চাচা। ঠিক হয়ে যাবে সব। চলেন বাড়ী যাই। যাওয়ার পথে আপনাকে পৌছে দেবোনে। মাঝির কাছ থেকে সারা না পেয়ে নদীতে গোসল করতে নামলো নিবারন।

তামুক নিবা না নিাবারন। দাও তোমার হুক্কা সাজিয়ে দেই। হ-দেন একটু তামুক থাকলে দেন। সারাদিন আজ হুক্কা টানি নাই। বুকটা খাঁ খাঁ করেতেছে।

বোঝছো নিবারন। দুনিয়াডা বড় আজব জায়গা। সংসারে আপন মানুষ গুলো কেমন পর হইয়্যা গেছে। আমি দয়াল মাঝি এক সময় দিন মজুর খেটে ছেলেপুলের আবদার মিটায়ছি। তোমাগো চাচীরে কখনও মানুষের বাড়ী কাজ করতে দেই নাই। সংসারে আমার অভাব ছিল না। দিনগুলি বড় সুখের ছিল নিবারন। এহন বুড়াবয়সে আমি হইলাম মাঝি। দুইবেলা ভাতের জন্য রোদে এই নৌকায় পরে থাকি। তোমার চাচী বেঁচে থাকলে হয়তো বাড়ীর এককোনে ঠাঁই পাইতাম। বড় আফসোস নিবারন আজ আমার কেউ নাই -- কেউ নাই। নিবারনের হাতে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠলো বৃদ্ধ দয়াল মাঝি। মাঝিকে সামাল দিয়ে গড়গড় করে হুক্কা টানতে টানতে মাঠ পেরিয়ে বাড়ির পথ ধরলো নিবারন। তখন থেমে গেছে মাঠের কোলাহল। রাখালের বাশির সুর মিলিয়ে গেছে গোধুলীর লাল সীমারেখায়। শুধু উঠানে উঠানে জ্বলে উঠেছে সন্ধ্যাপ্রদীপ। সেই বিষন্ন সন্ধ্যার মগ্নতা ভেঙ্গে চাটাই-এর শিখা আলো-আধারীর মেলা বসিয়েছে ঘরে। গাঁয়ের ভরা পচা ডোবায় তখন বসেছে

ব্যাঙের আসর। বহুরদুরে এক জনমানবহীন শূন্য ভিটে থেকে ভেসে আসছে শিয়ালের হাঁক। যেন এক বিসাল দ্রঃস্বপ্নের রাতের হুশিয়ারি সংকেত ধ্বনিত হচ্ছে তারপাশে। সেই অন্ধকারে পথের বাঁকে, কাদা জলে ক্লান্তির ছাপ ফেলে ঘরে ফিরলো নিবারন।

অনেকবছর থেকেই সরকার গোষ্ঠীর দাপট চলচ্ছিল বাশিনগর গায়েঁ। কিসের প্রতাপে যেন সর্বদা বলশালী ছিল সরকার গোষ্ঠীর লোকজন। দাঙ্গা হাঙ্গামার যেমন সেরা ছিল তেমন তাদের কু কর্মে আর অবিচারের শোয়নে শোষিত ছিল গ্রামবাসী। এই ভীত্রশ্রদ্ধার সুযোগ নিয়ে সরকার গোষ্ঠী হয়ে উঠলেন পরিক্রমশালী। ভালো অবস্থানসম্পূর্ন সরকার বাড়ী রাখাল পাখালের মধ্যে ও সহজাত বীজ অঙুরিত হয়ে একই গুনে বিকাশিত হতো। শত নির্যাতনের মধ্যেও মুনিবের নুনের মূল্য দিতে কুকুর বেড়ালের মত এ বাড়ীর মাটি আঁকরে পড়ে আছে বহুবছর। বাড়ীর সীমানা ধরে পঞ্চাশ বছরের পুরানো আম গাছটি ও মাটির ঋণ শোধাতে শিকরে আঁকড়ে বের করে এখনও মনিবের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। পুরানো এই বিশাল পাকা দালানোর ইট বালুর সাথে গেঁথে আছে সরকার বাড়ীর কালো ইতিহাস। উপচেপড়া সহায় সম্পতি থাকা সত্ত্বে ও সম্পদের খায়েস মেটেনি সরকার গোষ্ঠীর। বাংশানুক্রমিক এই গোড়ামী এখন এসে থেমেছে মেঘলালের হাতে। ছোটভাই, রতিলাল বরাবরই ছিল সংসার বৈরাগী। আত্মভোলা রতিলাল পিতার বিষয় সম্পত্তির খোঁজখবর রাখেনি কোনদিন। অভাবে আর দুঃখে গ্রামবাসীর পাশে দাঁড়িয়ে সকালের প্রিয়জন হয়ে উঠেছিল রতিলাল। অন্যদিকে মেঘলালের সিংহ গর্জন আর আবিচারের জন্য সবাই ভীত শ্রদ্ধা নিয়ে উচ্চারন করতো তার নাম। বড় ভাইয়ে প্রতি রতিলালের ছিল অগাধ বিশ্বাস। আর এই সরলতার সুযোগে পিতা জীবিত থাকতেই আখেরী গোছাতে থাকে মেঘলাল। এরপর পিতার মৃত্যু শয্যায় গোপনে চুড়ান্ত দলিলপত্রে সই করিয়ে নিজের নামে সব সম্পতির মালিকানা তুলে দেয় মেঘলাল। এরপর নিজের খেয়াল খুশীতেই সমাধা হতে থাকে সরকার বাড়ীর কাজকর্ম আর অন্ত পুরের গিন্নীপনাটা মেঘলালের স্ত্রীর ইসারার চলতে থাকে। কিন্তু এত ঐশ্বর্য আর সম্পত্তির মাঝখানে রতিলাল যেন পথের কাঁটা হয়ে দাড়াঁলো। একদিন সবার অজান্তে বিয়ে করে বাড়ি ফিরে রতিলাল। স্ত্রীর ইশারায় সেদিন রোষানল দমন করে মেঘলাল। অন্ত ঃপুরে স্থান পায় পঞ্চমী। কিন্তু গৃহকর্তী সন্দেহের দৃষ্টি থেকে সে রক্ষা পেল না। কিছুদিন না যেতেই গাড়ীয়ালের মেয়ে পঞ্চমীর আসল পরিচয় জেনে যায় সবাই। পনের টাকা বুঝে না পেয়ে বিয়ের আসর ভেঙ্গে ফিরে চলে যায় বরযাত্রী। বৃদ্ধ পিতার এই অপবাদ আর অপমানের জন্য পঞ্চমীকে সবাই অপয়া, কুলক্ষনা বলে ধিক্কার দেয়। তখন রতিলাল স্ত্রীর মর্যাদায় ঘরে তুলে পঞ্চমীকে। এসব জেনে ক্রোধের আগুনে জ্বলে উঠলো গৃহকর্তী। সেই রাতেই সরকারের লোক গিয়ে ভিটেছাড়া করলো পরান গাড়ীয়ালকে। মেয়ের সুখের জন্য স্ত্রী পুত্র নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল সে। রাতে আঁধারে কে কাকে ভিটেছাড়া করলো এসবই অজানা রয়ে গেল রাতিলালের কাছে। তারপর সরকার বাড়ীতে ঝি-এর মর্যাদা পেল পঞ্চমী। হুকুমের দাসী হয়ে মুখ বুজে সহ্য করলো গৃহকর্তীর শত অপবাদ আর নির্যাতন। কিন্তু রতিলালের কিছুটা করার থাকলো না। তারপর মেঘলালের পুকুর চুরির কথা ও আর গোপন রইল না। একদিন বিষয় সম্পত্তি ভাগ চাওয়াতে প্রচন্ড বিরোধ সৃষ্টি হলো দুভাইয়ের মধ্যে। স্বার্থে আঘাত লাগলো মেঘলালের। সকলের কাছে রাতিলালকে উম্মাও সাজিয়ে একদিন জোড়পূর্বক সিড়িকোঠার অন্ধকার ঘরে আটকে রাখে রতিলালকে। আর সেই সুযোগে গৃহকর্তী গলাধাক্কা দিয়ে সরকার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয় পঞ্চমীকে। দিনের পর দিন আলোহীন সেই অন্ধকার ঘরের দেয়ালে দেয়ালে মাথা ঢুকে মুক্তির জন্য চিৎকার করে রতিলাল। কিন্তু মেঘলালের কঠিন হৃদয়েভাইয়ের সেই আকুতি পৌছে না। সরকার বাড়ীর শক্ত ইট পাথরের দেয়ালে সেই আর্তনাদ প্রতিধ্বনী হতে থকে। প্রানের ভয়ে সহৃদবান রাতিলালের প্রতি এতটুকু করুনা দেখাতে কেউ সাহস পেল না। মাসের পর মাস অন্ধকারে একাকীত্বে থেকে স্মৃতি শক্তি হারিয়ে ফেললো রতিলাল। এদিকে নিরুপায় পঞ্চমী ফিরে গেল নিজের গাঁয়ে। কিন্তু পাড়া পড়শীরা কেউই তাকে সাদরে গ্রহন করলো না। গরীব গাড়িয়ালের অপমান আর লাঞ্চনার জন্য পঞ্চমীকে দায়ী করে সবাই ধিক্কার দিতে লাগলো। সকলের বিতৃষ্ণা আর কটুক্তির মধ্যে বাবার শূন্য ভিটায় আশ্রয় খুজে পেল পঞ্চমী। এখানেই জন্ম হলো নিবারনের। মানুষের বাড়ী কাজ, লাকড়ি খুড়িয়ে বিক্রি করে যা রোজগার হতো তাতে চুলোয় আগুন জ্বললো ঠিকই কিন্তু সন্ধা প্রদীপের তেলের জোগার হলো না। এমন অনেক রাত কেটে গেল শুধু চাঁদের আলোকে সম্বল করে। এভাবেই অতিকষ্ঠে নিবারনকে বুকে নিয়ে দিন যেত লাগলো। কিন্ত অভাবের পাল-ায় জয়ী হতে পারলো না পঞ্চমী। অবশেষে নিবারন বড় হলে একটুকরো জমি বন্ধক দিয়ে গাড়িয়ালের হাল ধরিয়ে স্বস্তির নি:শ্বাস ফেললো পঞ্চমী। এভাবে কেটে গেল অনেক বছর। পথ চলতে চলতে সংসারে হল নিবারনের। কিন্তু অনাবৃষ্টির মতো অভাব ঘরে বাইরে মরুভুমির রোদের মত খাঁ খাঁ করতে লাগালো। এদিকে বাশিনগরের নতুন গাড়িয়ালের খবর পৌছে গেল সরকার বাড়ীতে। গোমস্তার কছে নিবারনের পরিচয় পেয়ে নতুন করে ষড়যন্ত্রের নতুন জাল বুনতে শুরু করলো মেঘলাল সরকার। এক গরীব গাড়িয়াল ভয়ের কারন হলো সম্পদের জমিদারের। ত্রিশ বছরের বন্দী সাপ যেন আজ বাইরে এসে ছোবল মারতে চাইছে মেঘলালকে। এই আপদ সরানো জন্য মরিয়ে হয়ে উঠলো সে। তারপর একদিন সরকার বাড়ীর উঠানে ডাক পড়লো নিবারনের। মায়ের নিষেধ সত্ত্বে নিজের আধিকার ফিরে পেতে সরকার বাড়ীর উঠানে গিয়ে দাড়ালো নিবারন। বিচক্ষন মেঘলাল নিবারনের সাথে সেইদিন কোন কোন্দল করলো না। একবিঘা জমি আর নগদ টাকা দেয়ার আশ্বাস দিয়ে মাকে নিয়ে অন্যত্র গিয়ে বসবাসের নিদেশ দিলো। কিন্তু সবকিছু উপেক্ষা করে সরকার বাড়ীতে মায়ের মর্যাদা চেয়ে চলে আসলো নিবারন। এই অপমান তীরের মত বিদ্ধ করলো মেঘলালকে। সম্পত্তির ভাগ ছেড়ে নিবারন যে অধিকারের ইঙ্গিত দিয়ে গেল সেটা বুঝতে বাকী রইল না তার।

সেদিন সন্ধ্যায় প্রতিদিনের মতো গঞ্জের পথ ধরে বাড়ী ফিরছে নিবারন। অমাবস্যার অন্ধকারে হারিকেনের নিভু নিভু আলোয় সবে মাত্র গাঁয়ের পথ ধরেছে। আচমকা সরকারের গোমস্তা পথ রোধ করে সামনে এসে দাড়ালো। কিছু বুঝে উঠার আগেই সজোরে লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত কললো নিবারনকে। তারপর বেধম মারধার করে রক্তাক্ত অবস্থায় পথে ফেলে রেখে চলে গেলে। সবাই গায়ের পথচারীরা চিনতে পেরে বেহুশ অবস্থায় বাড়ী নিয়ে আসলো তাকে। ছেলের এই করুন অবস্থা দেখে বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগলো পঞ্চমী। দুয়ারে গিয়ে এই অন্যায়ের বিচার কামনা করলো। কিন্তু পাড়া-পড়শীরা কোন কথা না বলে দরজায় কপাট দিয়ে ভিতরে চলে গেল। কেউই তার দুঃখের সমবেদনা জানানোর সাহস পেল না। সারা শরীরে অসহ্য ব্যাথা আর জ্বরে নিবারন ছটফট করতো লাগলো। রাতভর ছেলের সেবা করে চোখের জলে বুক ভাষালো পঞ্চমী। তখন নিশি রাতের শেষ প্রহর। সরু চাঁদের নীল জোছনায় ঘুমিয়ে আছে সারা গাঁ। হঠাৎ ঘরের বেড়ায় আগুন দেখে জেগে উঠলো পঞ্চমী। চারদিকে আগুনে জ্বলছে সব। দিশাহারা হয়ে জাগিয়ে তুললো গোপালকে। ঘরের বেড়া ভেঙ্গে বাইরে এসে চিৎকার করতে লাগলো পঞ্চমী। আগুনের তাপে হুস পেয়ে বাচাঁর জন্য নিবারন গোঙাতে লাগলো। কিন্তু এক পাও এগুতে পারলো না। আগুনে বেড়া গুলো একের পর এক ভেঙ্গে পড়লো নিবারনের উপর। নাতীকে বাঁচাতে গিয়ে ছেলেকে হারালো পঞ্চমী। উঠানে বসে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো নিবারনের মা। চোখের সামনে চিতার আগুনে জ্বলতে দেখলো ছেলেকে। গাঁয়ের লোকজন এসে একটি আধাপোড়া ঝলসানো লাস উদ্ধার করলো। সবাই যখন ঘরপোড়া মানুষ নিয়ে ব্যস্ত তখন গোমস্তার ইশারায় গোয়ালঘরেও বড় ডাকাতি হয়ে গেল। এরপর ভোর হলো। আষাঢ়ের ঘনকালো মেঘের নীচে জ্বলতে লাগলো নিবারনের চিতা। আর নিবারনের ছেলে গোপাল এক খাটি ছাইয়ের জন্য দাড়িয়ে রইল শশ্মানঘাটে। চোখের জল শুকিয়ে পথে ঘুরতে লাগালো পঞ্চমী। কখনো হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। একা একা প্রলাপ বকতে লাগলো। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা তার পিছু পিছু হেটে ঢিল ছুরতে লাগলো। এসব দেখে শুনে সরকার গোষ্ঠী আড়ালে মুখটিপে হাসলো। আর অনাথ গোপাল একটু স্নেহের লোভে দাদীর পিছু পিছু সারাদিন পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। হাতধরে টানতে লাগলো।

চলোনা দাদী ঘরে ফিরে যাই। আমার খুব খিদে পেয়েছে।

তুই কে রে হতছাড়া, সারাদিন ঘুরঘুর করিস। ফের যদি দেখি তোকে, ঢিল ছুড়ে মারবো।

তারপর অতৃপ্ত নিবারনের আত্মাও পথ চলতে লাগলো এই বাঁশিনগরের মেঠোপথে। নদীর ঘাটধরে গরুর গাড়ী নিয়ে ক্যাচ ক্যাচ শব্দ করে বাড়ীর দিকে এগোতে থাকে নিবারন এ্যই ডাইনে যা .....ডাইনে।

OUT OF AFRICA

- Rev. David E. Schlaver, CSC
Holy Cross Mission Center, Notre Dame, Indiana.

Continued after previous issue...

Merry Christmas from Nairobi!

January 4, 2006

New Year's Greetings from Kampala!

The music and fireworks are over and another year has begun. Elections loom ahead for Uganda, complicated by the jailing of the main opposition leader and the attempt of the long-time president Museveni to stay in office even longer. Yesterday (January 3) the opposition leader was released from jail but the elections are still ahead and the results very unpredictable. The many positive achievements of Museveni's term risk being forgotten as he seems to want to become "president for life" as so many of his African predecessors. It is a strange world!

I last wrote from Nairobi, Kenya, where I spent Christmas day going from church to chapel, celebrating with the enthusiastic choirs and congregations in their long and joyous prayers and greetings. The few remaining in our seminary for Christmas came to the parish to join us for lunch and a restful afternoon. Then our little international community at Holy Cross Dandora met them at the Masai Meat Market restaurant on top of a modern shopping mall on the other side of Nairobi for a late dinner. Meat is a major part of the diet here: the usual beef, pork and chicken, and at a restaurant you can also get more exotic lamb, ostrich, and crocodile. Grilled, fried, shish-ka-bobbed, you name it! Platters of meat with side dishes of grains, bananas, and cabbages. Not a very helpful menu for a dieter! The open-air restaurant showed off the Kenyan sky and brought some cooling breezes. As I looked around the place I saw little charcoal burners brought out to warm the air around the diners. I was still sweating from the day's sun!

On the feast of St. Stephen (Dec. 26) the church filled again for morning Mass. I spoke of Stephen's commitment and our own, moving quickly from the crib to the reality of daily life and even martyrdom. How well the people understand this. But they also want to extend the joyful hopes of the season as long as possible. After Mass I went grocery shopping with Fr. Simon Mwangi, at a trendy supermarket not far from Dandora. The shelves were well stocked - sort of a combination of Sam's Club and Krogers, with 100 varieties of everything (instead of our 1000!). The prices are not cheap, so it is easy to see why the numerous poor do not frequent these places. Even a small frozen chicken costs between $2-$3, hardly daily fare for a struggling family. So they manage on rice, matoke (mashed bananas), and beans and less than a dollar a day!

That evening I moved over to McCauley House, our seminary for Holy Cross students studying theology at Tangaza College, a large consortium of religious communities and lay organizations serving the church in East Africa (with students from around the world). All of us went to "Carnivore" a huge restaurant and arts-and-crafts exhibit for long leisurely dinner at the Simba Saloon.

Brother Cleophas arranged for me to meet more of the Kibera women the next morning, so I listened to Isabella and Margaret (#2) who represented a small group of women who are trying to start and maintain small businesses in Kibera, selling vegetables, rice and other grains. These women are anxious to educate their children to give them a way out of poverty. It is often a losing battle, but their hope and courage is so admirable! I walked with them down into the massive Kibera slum projects - well over one million people in huts, tin sheds and various types of old containers - as far as the eye can see. We met the first Margaret - from the "living positively" group - on the path. She took over and guided me to her house, where 10 people live in her extended family. She pays $20 per month in rent and tries to educate her children, grandchildren, and several orphans, living with her positive attitude and spirit! If anyone will ever succeed, it will be Margaret! Margaret takes pride in the number of visitors she has brought to her home to listen to her stories and those of her neighbors. Their smiles and warmth make a very positive impression on everyone.

In the heat and dust (and altitude) of Kibera I was a bit concerned about conserving enough energy to get back to our house, so I declined to go much further, but promised I would try again at the end of January before leaving Nairobi. Margaret's firm arm guided me among the many splinter-group churches, across the slippery rocks, around streams of flowing sewerage, and finally back up to McCauley House where we shared a Coca Cola and more dreams for the future.

Cleo and I had a ham and pineapple sub sandwich at the nearby Pizza Inn later in the afternoon and went on to the Giraffe park near Tangaza. This is a new and fancy area of Nairobi, with many religious houses, schools, and institutes, along with many wealthy estates. Cleo has been at our seminary for nine years now and knows the people and places of this "Vatican" enclave. But everything is closed down now for the holidays, so I'll have to visit again later in January. Meanwhile, we fed the giraffes (what long tongues they have!) and watched the wart-hogs root around in the mud at the park. Extensive archeological and geographical displays make this a favorite spot for groups of city children to experience a bit of the country and wildlife. Kids from Kibera and the many other slums often get a chance to do this because of donations of other visitors.

On the way back to our house we stopped at the Missionaries of Charity "Home of Peace" nearby, where 57 female mentally and physically handicapped patients are cared for by twelve Sisters and some volunteers. A newly professed Kenyan Sister showed us around and said she would soon be on her way to one of their homes in Haiti. When we got back to our place Brother Cleo asked if I had any dollars; it seems that any bills older than four or five years are suspect here because of frequent counterfeiting, and even banks won't take them. So we went through his pile of bills, replacing them with some of my newer ones. I hope that the banks at home will honor mine! At least this will

keep me from spending what I have while here.

After a pretty sound sleep - punctuated by the night sounds of the nearby Kibera slum and the inevitable loud music and shouts of children, we started out for Uganda at 5:30 am. Cleo and Willy drove west across Kenya through the Great Rift Valley. In some ways it is like crossing the western deserts of the USA, sagebrush, tumbleweed, hills and valleys, with only an occasional pedestrian or bicycle. Large lorries (heavy trucks) bearing petrol and goods to Uganda, Rwanda and the Congo, hug the road, negotiating the rises and falls of the dry landscape. We passed through Kenyan cities of Nakuru, Kericho, and Kisumu and finally reached the Ugandan border at Busia around 1 pm. We walked across the hot, dusty, and quite barren border, got our passports checked, and finally the automobile documents were in order and taxes paid so we could import the car. Money changers were everywhere, offering "better rates" - though I wonder whether my now "ancient" dollars would have been acceptable to them. We got in our car again, building up very little speed, passing through the endless shops, vendors, pedestrians and waiting bus passengers, anxious to leave Busia behind. The roads got worse and worse, with potholes that only recycled computer parts could possibly have filled! The dust was thick, but I could see endless little shops/houses, with verandahs shading the front from the bright sun. Not much life at 2 pm on a hot afternoon however. As the week went on, the motionless air of Uganda at this lower elevation got heavier and hotter, clearly a more tropical climate.

Uganda is only about half the size of Kenya (90,000 sq. miles), with a population of 27 million. Lake Victoria (second largest freshwater body in the world, after Lake Superior) covers the southeast chunk of Uganda and parts of Tanzania and Kenya as well. The greenery and rolling hills of eastern Uganda are markedly different from the other countries. No wonder it was often dubbed (by Winston Churchill I think) "The Pearl of Africa." Other large lakes lie in this region of East Africa - The Great Lakes Region. Interestingly, Lake Victoria is about the size of Bangladesh, which has to house and support 140 million people! Later as we reached Jinja we saw the headwaters of the Nile, appearing to flow out of Lake Victoria to the north, through the deserts of Ethiopia and Sudan and Egypt, and eventually on to the Mediterranean Sea at Alexandria. Like the Amazon, the Mississippi, the Ganges, and the Yangtze and the other great river systems, it brings life to millions who depend on the flowing water.

Finally we reached the villlage of Bugembe, a bit east of Jinja, where Holy Cross Parish was established some 15 years ago. The last 20 miles or so were the worst roads I've seen yet, with potholes that could bury you! Apparently corruption and inability to fulfill the contract had led to cancellation of the project, and the road remains to be repaired! Fred Jenga, ordained from this parish last summer, showed me around. The compound is a motley collection of buildings, beginning with the old parish house where the king used to reside, now rented by the community from his family. Nearby are schools, the old church and offices, a home for our college-age seminarians who study at a nearby PCJ consortium for their BA, the Sisters novitiate, and a big new church. I did not explore too much after arrival, since I'll be coming back for a week later in the month. But the foliage, gardens, and building style we so familiar from my travels around India and Bangladesh. Simple, functional, and at least adequate for the time being. But here we are faced with ever-increasing numbers of candidates, a team of brothers and priests working at the school who had been evicted from their house that very day, and the "house of the king" unable to meet all the needs of everybody!

Once again I am seeing the needs of one of our missions in stark reality - which will occupy my efforts upon returning to the USA! As I see so many of our "older" buildings, homes, offices, and even churches being torn down or renovated in the USA, I wish I could transfer them here to meet some of these needs! Fr. Serapio Wamara is in charge, but Fr. Bob Hesse, one of our first three missionaries to come to Uganda in 1958, also makes his home here at Bugembe. Bob dutifully sprayed my room for mosquitoes and then 10 of us gathered for dinner and conversation, and a chance to share the dreams of the community at Bugembe.

The chickens around the compound remained blessedly silent until the early morning hours. After Mass and breakfast on December 29th we set out for Kampala, the capital of Uganda, about 50 miles further west on Lake Victoria. We passed over the Nile and saw the broad expanse of waterfalls, dams, and power generating stations, providing electricity for much of Central and East Africa.

Our Holy Cross headquarters in Kampala is on a hillside overlooking this city of over one million, with many religious houses. We are just around the corner from the "new" and heavily fortified American embassy. I was surprised to learn that Uganda has 19 dioceses within four archdioceses, with the requisite number of bishops and their entourage. The great majority of people are Christian, and probably half of those are Catholic. Uganda is more Catholic than the other countries in East Africa, and tribal differences - at least in recent years - have caused less political and religious turmoil than in Kenya. The people seem to value education very highly, and schools are everywhere! English is widely spoken, and after a bit of effort to filter out the heavy accents, quite cultured and accurate. I am very impressed with the fluency of our young seminarians and brothers. But at times I have to tell them to SPEAK UP, since there is the crazy deference to age and status that can create a nation of mumblers! Of course that sometimes happens even back home!

There are many diocesan clergy and parishes here in Kampala and throughout the 19 dioceses, as well as numerous religious communities of priests, brothers and sisters.
Their "compounds" (at least in the cities) all have attractive colorful buildings, nicely landscaped with grass and trees and brick paths that wander through quiet interior grounds. BUT everything is INSIDE big iron gates, and outside are nearly impassable access roads! This phenomenon I have seen virtually everywhere in my travels. Common property is definitely NO ONE's property! Open sewers, garbage, and potholes abound outside the gates! How blessed we are in most places in the USA to have a civic sense that would not allow this to happen; at least not yet! Though at times I get worried about the growth in "gated communities" in the USA and hearing people complain about taxes - even for the essentials we take for granted. Remember: Lazurus is still sitting outside that gate, in Dhaka, Kampala, or even

Granger Indiana! (By the way, gasoline is about $5.00 per gallon in Kenya and $6.00 in Uganda! Enough said?)

After greeting all the guests and residents who gathered at Bishop McCauley House most of us moved down the "road" and around the "corner" to St. Augustine's Institute, a diocesan pastoral and retreat center which would be home for the next week. After evening prayer and dinner the chapter (meeting) of the District of East Africa officially opened. In addition to 34 African members from the three countries (Kenya, Uganda, and Tanzania), 10 priests and brothers from the USA are members of the district. Along with a number of visitors and observers like myself, 54 of us gathered in a hot upper room for the sessions. Committee work - on mission, formation and community life, government, and finances -- made up much of the meeting time of the first few days.

The variety of people present for this meeting and the issues made for some lively meetings. But the real advantage is the coming together of so many Holy Cross people, sharing brotherhood, ministry, and future dreams and hopes. So the gatherings are always a real positive experience. I was particularly impressed by the enthusiasm of the younger members, who are preparing to serve in a variety of ministries, parishes, schools, and social projects, without knowing what the future might hold for them. We ended last night (January 3) and the participants began to scatter to the ends of the district, renewed by the opportunity to spend a week together.

Today I went with Fr. Tom McDermott, who has been here most of the past 18 years in various capacities. Mutual friends, Chris and Lois Costello of South Bend joined us. They are working in a health project in Kerichu, Kenya for two years. We visited Uganda Martyrs University about 50 miles from Kampala. It is a relatively new project with great possibilities for the future. The Ugandan bishops have been supporting it and now Holy Cross is offering some personnel to help build a future there. About 800 full-time students attend and there are some further programs, also at night in Kampala. The support of the European Union and various bishops in Europe is making this miracle possible. Tom and others from Holy Cross are in on the project and the future is bright.

Tomorrow (January 5) I leave for Fort Portal in the west, a five-hour drive. This was our first mission back in 1958 and many Holy Cross people are still ministering in that area. I am not sure when I will be able to send another report, so I am struggling to finish up tonight and send this. I'll be back in this area (Kampala) and Jinja on January 12 and will try again.

Many blessings and Happy New Year from Kampala!

January 14, 2006

Greetings once again from Uganda!

It will be another sunny and warm day in Kampala, the hilly capital of Uganda. After a week in the western regions I returned here yesterday afternoon with Brother Alan Harrod; a was a fairly easy and quite scenic drive of about 200 miles (five hours) from Fort Portal. Crowds gathered along the route, awaiting a glimpse of their president, Yoweri Museveni, who has been campaigning around that region. Banana branches, the sign of his NRP party, were placed at strategic points in the towns and villages we passed through. Though we did see a short caravan of speeding police and military vehicles ahead and behind one Mercedes, it appears that was only the vice president's entourage. We finally met the president's motorcade streaming out of Kampala just as we entered, a much longer line of vehicles and a much longer stretch Mercedes limo!

Money flows during election time here (and everywhere I suppose) as taxis and motorcycles receive free petrol for carrying a picture of the candidate, and I am sure many other favors are dispensed. The election is about six weeks away, but it will take a lot more energy (and money) to build up much enthusiasm for any of the four candidates, though the daily papers are full of their charges and countercharges, manifestoes and promises! Musenveni - already in office for 20 years since he toppled Milton Obote -- looks headed to a third elected term; he managed to change the constitution to allow this. His three main opposition candidates (one of them the widow of Obote) can't seem to agree to coalesce, so he has little to fear.

Western Uganda is lush, tropical, and rolling, with distant mountains (the Ruwenzori - some over 15,000 feet), small towns and simple houses dotting the hillsides. Lots of tea is grown here, on beautiful terraced landscapes, evenly picked to create a green carpeted effect, with narrow paths crisscrossing the fields. Holy Cross missionaries came here in 1958 to assist in the distant parishes of what would eventually become the Diocese of Fort Portal. The guidebooks call it the most picturesque town in Uganda, and that may well be, though it is difficult to catch the full flavor while concentrating on the terrible broken and dusty roads that curve through the town, trying to avoid the "bodabodas" (little motorcycles which carry passengers - named this because of their owners'shouts of border/border as they try to ferry people from one border post to another), and other obstacles.

Several hills dominate, one the Catholic hill, another the Church of Uganda (Anglican) hill, another the Muslim hill, and finally the tallest of all, the King's hill, home of the teenaged-king of the Toro tribe. He was likely away studying in middle school, so we didn't climb the hill. His mainly ceremonial functions have been carried out by regents since his ascension to the throne in childhood. But his palace - restored by Mohamar Ghadafi of Libya after it had been ransacked when Idi Amin and Obote abolished the various kingdoms in Uganda - reigns again over the shops and marketplaces of this quaint headquarters of the Kabarole District.

The "Virika" cathedral is a marvelously simple, functional, and colorful church-in-the-round, built by Vincent McCauley, CSC, during his short time as bishop of Fort Portal. He and two other Holy Cross missionaries came here in 1958 and decided it was a good place to set up a mission. McCauley had first worked in Bengal, India, and I am sure that he too saw many similarities in the people and their needs. Eventually he was named the first bishop of the new diocese, but within a few years, a Ugandan followed him and he moved on to work with all the bishops of East Africa in Nairobi.

I had driven here from our headquarters in Kampala on January 5 with Sister Lillian Sullivan (who teaches at the seminary here) and Fr. Dick Stout (who assists at our novitiate near Fort Portal). We stopped at another impressive cathedral on the way, in Mityana, where sever-

al of the Ugandan Martyrs are honored. (I'll say more about them after I visit their main shrine next week). The road from Kampala to Fort Portal was quite good - at least until we reached the city! After a quick lunch at "The Gardens" downtown we reached the house at Virika, which became my home for the next week.

On Brother Andre's feast (January 6) Brother Alan Harrod and I drove out to our novitiate at Lake Saaka, only five miles, but half an hour as the 4-wheel vehicle crawls! The lava and slate-lined road is not easily navigated, but this first of several trips was most scenic and memorable, past the prison, broken half-finished houses, fields of maize and young trees, and eventually into the grounds of Holy Cross Novitiate. Near the entrance is the community cemetery, with a large tree marked with the names of those who have died in East Africa over these 48 years. Only one grave is there, that of young Erogi Asiimwe, a deacon, who died just a year ago after an explosion and fire. He rests in peace now in the quiet forest where his Holy Cross journey had begun some years before.

I must say we manage to find beautiful spots to train our young novices around the world. This one overlooks scenic Lake Saaka with the towering Ruwenzori Mountains in the distant cloud-covered background. On a clear day snow can be seen. Flowers and trees line the grounds down to the lake, an algae-filled crater lake, probably several times larger than the combined Notre Dame lakes. The nine novices had gone to town on their bicycles to attend the profession and jubilee celebration of the local Banyatereza Sisters at the cathedral. Alan and I had decided to forego that five-hour celebration, in favor of a shorter and quieter one, sitting with Dick Stout overlooking his manor and Lake Saaka!

Saturday Fr. Dick Potthast came to Fort Portal for shopping and then took me with him to Kyarusozi, his parish about 50 kilometers to the northeast. After lunch we toured the grounds, surveyed his magnificent new church under construction, and then went on to Kyembogo another five miles or so, to see the St. Joseph Hill school complex, a number of new, under-construction, or still dreamed-about buildings which provide secondary education and eventually housing to several hundred children from the surrounding area. Brother Deo Magezi is the headmaster and also directs the nearby farm, which raises tea, some cattle, and tree seedlings. No one gets by with a single job here! Volunteers Jessica and Michael come here each day from their house at Kyarusozi to teach math and science.

On the way back to the parish, Dick took me to visit Angelina, a dedicated catechist and jill-of-all-trades around the parish. She prepared her famous scrambled eggs, tea, and various fruits, and promptly "christened" me AMOOTI - my new pet name for Uganda. After signing her guest book - seems like everyone had been there before me! - we stopped at the Holy Cross Sisters house across from the parish. A group of them run a large clinic and health-care program in Kyembogo (and raise turkeys on the side!). We ate some of Dick Potthast's famous sweet corn for dinner, after looking over Brother Bernie Klim's variety of workshops and projects.

Sunday Dick took me to Kassaba village, to the new St. Francis Xavier church for Mass. Angelina went along part way, stopping at her designated mission for that day. She is part of the Family Ministries team and conducts Sunday services, rosary, and prayers for the people nearby. The crowd kept growing in Kassaba, the choir was tuning up and practicing, Dick heard a lot of confessions, and after "high tea" we began a two-hour plus liturgy, during which I had the thrill of baptizing little Joseph. He smiled throughout and enjoyed the cooling waters. As the Mass concluded, we listened to three long songs of thanksgiving in the three local languages, accompanied by enthusiastic dances and shouts of joy. I thanked them for their joyful welcome and indicated that a bit of sustained effort on my part to dance with them would definitely benefit my diet! We ended with a chicken dinner with their catechist and his family.

Dick took me back to Virika late that afternoon and Alan Harrod and I went on up that wonderful road to Saaka to join Dick Stout and his novices for dinner and community night. I was happy to meet all of them, a most impressive group. Heavy rains fell during our visit and on through the night. Back at Virika the power failed and the night was long and dark. The morning sounds of animals and birds brought everything back to life, well-watered now by the winter rains.

Brother Alan Gugel had been busy ministering to a very sick woman and her family these days, as well as trying to finish up his work to return to the USA in a few weeks. Topista passed away during the early morning hours and arrangements were made for a burial that same afternoon. Family and friends were in and out all day, grieving her death, but also thanking God that her sufferings were over.

Alan Harrod and I drove back to Saaka so I could spend the morning talking with the novices about my life and experiences in Holy Cross. At the end of the morning we celebrated Mass in their newly painted (by them) chapel and then ended with a spontaneous dance accompanied by their vigorous drumming and singing. The baptism of Jesus could not have been more lively on the banks of the Jordan!

On Tuesday Holy Cross, including those nine cycling novices (who are used to driving their "two-wheeled Pajeros" up and down the Saaka road) gathered at the nearby Sisters' convent to celebrate the 80th birthday of one of their Ugandan pioneers, Sr. Edward Ann Wetzel. Her big smile grew even bigger during Mass, dinner, and presentation of gifts. Sister Eddie Ann took on her East African mission after over 20 years teaching in the USA, and now has been here nearly 40 years. Her "Mary's Craft and Card Shop" provides a livelihood to many village women as well as an interesting place for visitors to buy local handicrafts.

The week passed quickly, visiting local places, meeting the stream of visitors, sharing with the novices, talking with the two Alan's, praying with the Sisters, and finally driving back to Kampala yesterday. In another hour I'll be going on to Jinja (50 miles east) to see our candidates and their Andre House residence and their school, our big parish at Bugembe, Lake View Senior Secondary School, the Sisters'novitiate, and maybe meet their beloved bishop Willigers. I hope I'll have a chance to summarize those days upon return to Kampala on Thursday before heading back to Nairobi and on to Tanzania. Another early morning rain has now watered the flowers and muddied the roads, and the sun is heating up the day.

Many blessings!

January 19, 2006

A final report from Uganda!

By all accounts, Jinja should be the Riviera of Uganda; a colorful, small city of 100,000+ (2nd largest in the country), situated on the northern banks of magnificent Lake Victoria which covers large chunks of Uganda, Kenya and Tanzania. Jinja has a similar charm to towns in the southwestern USA, like a dilapidated Santa Fe. Palm trees and banana plants everywhere, warmed by a tropical climate on the equator at the very source of the Nile River. Everywhere you can see the struggle and frustrated hopes for an extensive tourism industry. But the prospects of Jinja declined rapidly during the Idi Amin era (70s) and the years since and the city has yet to bounce back. Abandoned factories, an extensive but erratic power grid generated by the dams of the Nile, and everywhere are scattered the empty frames of potential houses and shops, now overgrown with weeds and brush. Good beer is still brewed here and lots of power generated, and somehow many people earn their living. But it is not a boom town!

In the surrounding hills live many subsistence farmers, growing maize and sugarcane, walking dusty roads and jungle paths to their mud huts with thatched roofs, occasionally brightened by red bricks from their own clay. Children wave and gawk as you pass by, shouting JAMBO (hello), amusing themselves in simple ways, with pieces of plastic, metal, or natural fibers, making toys to satisfy their day's longing for companionship.

On Tuesday (January 17) President Museveni came to Jinja. He was hours late as tends to happen in these days of frenetic campaigning, but his roving band of supporters, draped in wilted banana leaves (his party's symbol), tried all day to build up and keep the crowds with their chants and shouts. Truckloads and minivans full of yellow-shirted youths, armed with bright pictures of their man and microphones connected to loud speakers, roamed the roads of Jinja and Bugembe, the nearby "suburb" where our parish is located. The main road is still in shambles and one never knows which side of the "island" to drive on, though one is usually worse than the other. I am told there used to be beautiful trees along the divided highway and a reasonably smooth road running east out of the city. No more the case, though for a few days before Museveni's arrival crews were filling in the worst potholes with gravel, red mud and a spattering of tarmac. It won't last, nor will it be completed. His support is relatively thin here, and the promises he gave Tuesday (including a $10,000 guaranteed annual income per family!) will likely be forgotten soon after his expected victory on February 23.

Universal primary education was a major promise last time for his victorious National Resistance Movement. Now he talks about universal secondary education. But those in the know say that will not happen; basic education is still far from universal. As in so many poor countries, few can afford education at all, even if the government does pay the school fees (for minimal teachers' salaries and infrastructure). But people cannot buy books and uniforms, or pay for transport (or boarding costs), let alone suffer the "loss" of extra hands in the fields and any potential income from the young boy or girl in the marketplace. So education remains a dream and illiteracy is rampant. Uganda has undoubtedly made some progress, but only a bit.

Yet schools are everywhere! Private and public, named after the towns or simply some creative twist on geography, religion, or language: Good Heart Primary School, Green Valley, Victory Secondary School, etc. Church-run schools also abound, many named after the Ugandan Martyrs, though most of those must charge fees to pay their teachers. Our parish has three primary schools (Holy Cross on the parish compound in Bugembe, St. Andrew's at Wanyange, and St. Jude's at Buwekula) and another, at Kalungami, which is now government supported, but somehow still church-managed. All have very inadequate facilities and they are trying to build hostels for boys and girls, kitchens, and additional classrooms and offices. Each has an "outstation church," a small building also used for occasional Sunday Mass or prayer services.

I ambled around the grounds of all three schools a few days ago, watching the laborious construction, meeting headmasters and teachers, cooks and matrons (who supervise the hostels). School starts again in a few weeks and lots of progress remains to be made. Throughout the hilly area you cannot help but notice the many half-completed structures of homes. Apparently people who have been able to purchase land, then start to build something on it to secure their rights, and also to invest their extra income as they have it - to prevent relatives from borrowing it! Little by little their dream house is built!

I arrived in Jinja Saturday noon, January 14, after a hot drive of 50 miles from Kampala with Brother Alan Harrod. We had hoped to avoid much traffic, but the Saturday morning markets and shoppers flowed out into the main road and slowed our progress. We had lunch at Andre House, down the road from our parish, where Fr. David Kashangaki (UND MA '05) welcomed us. It is the candidate house for Holy Cross, with 25 young men living there and studying at the Philosophy Centre Jinja, a consortium for college-level studies in philosophy and religion for candidates from a number of religious orders. Holy Cross was in on the groundwork of the PCJ in 1989 and has provided teachers from the USA and East Africa, some short-term and some long-term, over the years. David now teaches economics and religious studies there.

Brother Jim Nichols works with him guiding and encouraging the 25 young men at Andre House. They come from Tanzania and Kenya as well as Uganda. Most are in the 20s and have successfully completed the complicated secondary school system. This "college" program lasts three years, during which they also decide whether to continue preparation for priesthood or brotherhood in Holy Cross. If they continue (as about half do), their next home is at the novitiate at Lake Saaka. Most had not yet seen that place, so I informed them that it is a marvelous site, maybe the most beautiful setting of our novitiates around the world.

Over the next few days I got to meet all of them and celebrate Mass, enjoying their songs in different languages and rhythms of the various drums, and sharing their simple meal. On Tuesday evening I talked with the whole group about life in Holy Cross around the world. I have been blessed to meet so many of our priests, brothers, sisters, and seminarians in different countries and am always happy to share the enthusiasm I have witnessed. Their vision for Holy Cross will carry us into the future and I told them they are preparing for life and

ministry in a very different world, church, and congregation. Internationality is the new hallmark and must be part of their (and our) vision. And we of the older generations must not only accept this, but embrace it with some of the same enthusiasm of the young people who are joining us.

I stayed in our old parish at Moreau House this past week. Brother John Flood, headmaster of Lake View Senior Secondary School near the parish, part of Holy Cross' ministry in Jinja, took me on a tour of his school Saturday afternoon. From the hills there is a magnificent view of Lake Victoria - at least of the bay or channel bordering Jinja. John is supervising the construction of a new girls hostel and badly needed kitchen. Generous benefactors from the USA are making these projects possible - as well as other projects at our primary schools. The schoolmaster's task never ends!

On Sunday morning while Fathers Bob Hesse and Fred Jenga went to outstations, I accompanied Fr. Serapio Wamara, the pastor, to the church a few blocks away. It is a large new structure, very simple and functional in design. The pews are still being built and plaques from the dedication (in November 2004) are still shiny, giving profound thanks to their "twin" parish, St. John of the Cross in Western Springs, Illinois. Each year some visitors come from that parish and discover new ways they can assist.

Sunday Mass was lively, and people drifted in almost on time so we started only a half-hour late. Serapio is trying to find a way to solve that "problem." The Mass went on for well over an hour, with lots of singing, long readings and prayers and a "dialogue" homily that he led while wandering the crowd, evoking positive smiles and responses. I offered to do the next Mass in English and tried to imitate him a bit. People were attentive and smiled, but I had less success at getting any response. Serapio said that the youth like the English and their choir sang songs from several other languages as well.

One interesting phenomenon I've noticed everywhere: The parish "announcements" - a long list of events for the following week, Mass intentions, upcoming weddings, parish meetings, and needs, read by the commentator before the final blessing. I am not sure how much is really heard, but I guess it is easier than trying to print a bulletin that either can't or won't be read. Once again in the USA we are spoiled by sponsors who pay the costs of our Sunday parish bulletins. After Mass, on the walk home, I was followed by the eager altar boys (and girl) and several others, anxious to find help for paying their school fees. This is a third-world-wide phenomenon I guess. I can't help admire their enthusiasm and wonder sadly at a world that spends so much more on armaments and war than education and health-care for its children - despite pronouncements of all presidents, prime ministers and dictators.

A couple of evenings while in Jinja we went to the Triangle Hotel "Annex" overlooking the bay of the lake from which the Nile begins its long trek northward. We enjoyed a few "Nile Special" beers, brewed locally, but I presume not directly from the river water. It is quite good! One night the four American Holy Cross Sisters joined us for a few hours of sharing experiences. Afterward, Bob Hesse (our pioneer in East Africa and founder of this parish at Bugembe), Brother John, and I stayed for dinner and we each feasted on a WHOLE telapia, complete with the head. The fish comes from the lake and is about 18 inches long. It was delicious! I know telapia fillets are becoming popular in the USA - farm raised - but this was much bigger and better and the whole dinner cost less than $5.00 each. The view from the balcony looking out over the river and down toward the lake is beautiful on a sunny afternoon. Little canoe-like fishing boats crisscross the Nile in the distance and a few larger trawlers head out toward the lake.

On Monday noon (and again Tuesday morning for Mass) I visited the Sisters of the Holy Cross at their formation house not far from Lake View. Their "view" is also quite impressive. Three candidates (also studying at PCJ) and five novices live here, with Sisters Madeleine Marie and Mary Louise, the founding headmistress of Lake View in 1993. Sister Eileen, who teaches spirituality at PCJ, and Sister Mary Alice, who directs the affairs of their community in Africa, live down the road at Olivette House, named after Sister Olivette who took the risk to send Sisters here in the late 1960s. They, too, attract candidates from our parish in Kenya, as well as different areas of Uganda, and have opened their program to candidates from Ghana in West Africa where the Sisters also minister and the Holy Cross Brothers have been working for almost 50 years. Three of their novices from here are now doing a program in Ghana. Africa is large and Ghana is a long way off, with many differences, but they are courageously crossing borders!

Tuesday morning after touring the simple but attractive and functional complex of the PCJ and going with Bob Hesse to see more of "Vatican Hill" filled with religious houses, the bishop's house and cathedral, and offices of the diocese, Serapio wanted me to see some of the tourist sites. So we drove about five miles north up the Nile and turned left to visit Bujagali Falls. The river is filled with large rapids or small waterfalls at that point, and it is a sight to behold. Young men offer to ride jerry cans over the falls to entertain the tourists. They were disappointed when Serapio declined to entertain his "tourist" in this way. Actually he remarked that it is quite an adventurous thing to see, but once while he was watching a young man was killed in the process and since then he decided he would not contribute to their dangerous practices. Somewhere back toward Jinja I hear there is a bungee-jumping spot - that would be hard enough to watch!

We left the falls and drove back through downtown Jinja to the area called "Source of the Nile," a scenic bluff overlooking the wandering shoreline and marking the spots where various explorers tried to take credit for "discovering" the source. Controversies abounded in the late 19th century but I guess they are all solved by now, by mapmakers and National Geographic expeditions. A current major problem, however, is the drastically lowered water level, not only of the lake but of the river at its source and as it flows into the Owen Falls Dam and power-generating station a few miles further up river.

Yesterday after lunch at the parish, Brother John and myself drove back to Kampala. We stopped at the Shrine of the Uganda Martyrs in nearby Namugonga, a strange edifice marking a strange "king" whose erratic behavior and violent actions took the lives of a large number of his Christian pages back in the mid-1800s. These young men have symbolized the "real" kingdom longed for by believers down through the years,

and are honored today throughout Uganda and the world. The shrine is a pilgrimage site and hosts revival meetings and retreats as well. Like the more sedate martyrs shrine in Mityana which I saw a few weeks ago, people come to pray and hope and the church recognizes and encourages their devotion and faithfulness.

At McCauley House in Kampala last night we witnessed again that this house is truly the crossroads of Holy Cross in East Africa, as five residents (James Burasa, superior; Alan Harrod, house director; Fulgens Katende, Family Ministries; George Muganyizi, development director; and Leonard Olobo, steward), and seven guests gathered for dinner. I wore my new Ugandan shirt, made-to-order by Brother Alan Harrod's favorite tailor Yves, a refugee from the Congo, who with his wife have taken in 10 Rwandese orphan children. He works hard and quickly and does beautiful work. I hope he didn't have to use up all his supply of fabric on me!

We've had rain almost everyday since the District chapter ended on January 3. But everyone keeps saying "the rainy season has not yet begun"! But the rain is really needed and they hope it continues, at least until the rainy season is supposed to begin!

Looking at the overall picture here in East Africa, I see lots of challenges ahead for Holy Cross. The needs of the people are certainly great, but so are the necessary resources for the community of Holy Cross to be able to continue to serve them. Andre House is way too small; all of the schools need hostels, kitchens, more classrooms, and housing for headmasters (government requirement) and teachers. Church buildings are now pretty much complete and adequate. Basic Christian communities are forming and people are providing moral and material support to one another. But locally generated income is almost nil.

I guess this has long been the situation in poor countries where missionaries have gone to teach and to heal, following Jesus' example. But eventually the people themselves have to assume the responsibilities of maintaining the infrastructure of church and school and hospital and supporting the clergy, religious, and lay workers who serve them. Progress is certainly evident, but in an unbalanced world economy with terribly inequitable distribution of resources, progress seems to go backwards! Benefactors from abroad are still vital, and a good number of students, faculty and friends from the USA who have visited our institutions here continue to help. Governments cannot and will not do it! And what IS given in government-to-government aid and support for research and development, seldom reaches the vast majority of the people. It has been a long wait and will be even longer. Meanwhile, we can only bring hope and moral and spiritual support, sharing what others have given us to share.

Today I am resting for the 12-hour bus journey tomorrow back to Nairobi and then six-hours on Saturday to Arusha, Tanzania and finally several hours by jeep to visit our newest parish in Kitete. Perhaps I will be able to send one last report before leaving Nairobi for the USA on the 31st. Pray for us!

Blessings!

January 30, 2006

Closing thoughts from East Africa!

Since the last report I have traveled to the furthest reaches of Holy Cross in East Africa and as I jot down these final thoughts, I am about to bid farewell to a most welcoming and dynamic community. These last days I have been staying with our men in formation, a group of 14 seminarians and brothers studying theology in Nairobi. Their spirit and commitment is most admirable; they are mostly in their late 20s and come from many different tribes and cultures in Uganda, Kenya, and Tanzania. Under the direction of Brother Cleo and Fr. Willy Lukati, they are the future of our life and ministry in this part of Africa and bring many gifts to the worldwide family of Holy Cross.

I bade farewell to Fr. Leonard Olobo on the morning of January 20, boarding the Akamba Royal coach leaving Kampala Uganda for Nairobi Kenya at 7 a.m. The ticket price of about $20 included a bottle of water and a box-breakfast of two pieces of dry French toast and a vegetable samosa. The journey of 400 miles took nearly 12 hours, over very bumpy roads and taking in many different panoramas of countryside. Buses, trucks and overfull (long-load) lorries roared past, and mini-bus "matatus" stopped anywhere along the road in the midst of traffic to take on or discharge paying customers.

Endless marketplaces were strewn along village byways, pieces of canvas and cloth
spread out on the dust, showing off wares of every sort: sidebags and rucksacks, combs, watches, plastic plates, used clothes and shoes, sunglasses, reading glasses, stationery, envelopes -- you name it! A notch above these ground-based shops are little wooden platforms (dukas) slightly elevated from the rocky ground, displaying vegetables, fruits, pots and pans and a higher-quality of everyday wares. A few of the larger towns were holding their weekly markets, and the speed bumps slowed us down enough to catch a glimpse of the many people bringing their goods for exchange or sale. We rode past endless barber shops and beauty salons (quite remarkable for this people of mostly shaved heads!), "gen. (for general) stores," hotels and restaurants and "take-aways," schools and soccer fields, mobile call stations and immense billboards advertising products most people could never afford. Everywhere young shepherds looked after their wandering cows and goats, bicycles and bodabodas carried impossible loads on back, often complete box-dukas, as owners searched for new spots to set up shop.

We reached Busia, the familiar border town, at 10:30 and I was able to use my single-entry Kenyan visa a second time with some raised eyebrows, but no real problem. Vendors approached from all directions, offering a better exchange rate on Kenyan shillings, wanting dollars (new ones only of course), and trying to sell all manner of handicrafts, packaged treats, bottled water, and recycled jewelry. It was convenient having no shillings of any country in my pocket!

"What is your country? USA. What state? Illinois. OH! Barak Obama! Yes, he is our senator!" On more than one occasion his name came up and the Kenyan pride beamed. We went through Kisumu on the banks of Lake Victoria, Kericho in the midst of tea plantations, and Nakura on the edge of the Great Rift Valley. I felt almost at home, seeing these familiar sights once again, and negotiating the bone-jarring rocks and bumps in the same old road. As the Friday night traffic in Nairobi built up, we found our way to the main station,

and after retrieving my bags from the roof of Akamba Royal, I found Brothers Francis and Mugo welcoming me with open arms and a nearby automobile for the ride to McCauley House in Southlands, overlooking the Kibera slum. Mugo managed the nighttime traffic skillfully and we reached the house of formation in time for dinner with the community. Now I knew them all and felt right at home. But the night was short; I had to repack for the next day's early morning departure for Tanzania.

On Saturday morning (January 21) Mugo and I boarded a 25-seat "coaster" for Arusha, several hundred kilometers south in Tanzania. First, of course, we had to "kick start your day with Nescafe" as the signs say. Coffee is always instant here as in most of the world I have traveled, and one hopes to find hot enough water to dissolve it. African brands are more popular, cheaper, and tastier I think. Our tickets cost about $10. Getting out of Nairobi is a challenge. This city of at least six million has grown and sprawled in every direction, and we had to pass through the endless factories and new growth beyond the airport and south of the center of town. Nairobi continues to draw thousands each month to seek their fortune and a "better" way of life, but the mystique breaks down quickly.

Soon we entered a desert. The Maasai people wander this seeming wasteland, prodding their cattle and goats, herders by trade and tradition. They are the largest tribe in Africa, spanning much of Kenya and Tanzania as well as Sudan and Ethiopia to the north. Their bright colored robes and tall physique, with staffs and spears, cast noticeable shadows across the horizon. Their pictures dot the tourist landscape and brochures as well. In curio shops and petrol stations, as at border crossings, those who have apparently given up shepherding for more lucrative tasks, sell their carvings, handicrafts, and ornaments with the skill of seasoned hawkers, smiling, cajoling, insisting, and ever-hoping. They frown only as the bus pulls away and they are left without customers.

A much-needed rain began as we disembarked on the Tanzania border. I was able to use an "old" $50 bill to buy my visa, and by the time we departed the customs post for Arusha, the rain had ceased. Dark clouds hovered over the hills, but did nothing to satisfy the thirst of earth or people. My nose started running about this time and sneezes plagued me for the next several days. I seldom get sick in my travels, but this "allergy" to some new dust or plant had me a bit worried, as well as uncomfortable and noisy!

As we headed south, the landscape became much more interesting, twists and turns, with endless acacia trees scattered across the hill country, and everywhere giant anthills - much as I had seen in western Uganda. These huge protrusions of red-orange mud loom upward like balled fists, occasionally poking a finger or two up toward the sky. Legends and tales abound, especially about the immense "queen" that inhabits each hill deep inside, keeping watch over her millions of ants, actually termites. No wood in the area is safe - which is probably why the acacia trees look so forlorn! But the termites must travel far and wide, for there are few houses nearby, only the round grass huts of the nomadic Maasai. Our men in Uganda tell stories of devastation of doors and window frames, however. It must take a lot of sawdust to keep the queen in the style to which she has become accustomed!

Our shuttle bus arrived on time (1 pm) at the Impala Hotel and we waited for the next leg of our journey. Arusha is a bustling city, one of the largest in Tanzania, home of the UN Tribunal on Rwanda and other international offices. It is easy to see why Arusha has also become a tourist haven. Mt. Meru forms an impressive backdrop for the city, the climate and green hills are more inviting than Nairobi's urban sprawl, and not far away to the east Mt. Kilimanjaro looms, African's tallest mountain. Several hours to the west just beyond where we were headed are the game parks and nature preserves, which bring tourists to East Africa. Fr. Aristides Massawe, a native of Tanzania, met us in the parish land cruiser and we headed off to Kitete - the end of the world of Holy Cross in East Africa.

Our vehicle competed well with the many cruisers and rovers filled with gawking tourists, though we didn't have the extended roof that stretches above, enabling the photographers and animal lovers to stand to get better views of their prey while taking in the breezes shaded from the sun. The road heading west was quite good, the best so far, even marked with a center yellow line, obviously providing a smoother ride to the paying customers. Petrol here is also about $5.00/gallon, but whatever income may have come from tax, did not pay for any good road beyond our turnoff near Karatu! The parish is about 20 kilometers inland from the main road - dirt and rock, hills and ruts - which Aristides negotiated masterfully. But it is clear why strong heavy vehicles are needed here, and in so many locations where Holy Cross serves.

St. Brendan's parish compound in the village of Kitete is indeed the end of the line, though roads to the 12 outstations crisscross the area. I was forever disoriented, wondering how they manage to find the way! Over the next several days I managed to see most of the stations, including the simple churches, some concrete and quite nice, others mud - and cow dung surely -- slapped on sticks and covered with tin. Some of the subparishes and outstations have primary schools, technical schools, and a shop or two; others are poised naked on windswept hills overlooking gorgeous valleys of fertile (but quite dry) fields, being readied for planting.

Water is a major problem throughout the area, with people walking miles to fetch a few gallons of the precious commodity in jerry cans carried on their backs or draped over their donkeys. A few "taps" in the forests - springs that one-by-one are drying up - quench their basic thirsts, but do nothing to water the crops they hope to plant soon, or satisfy their scrawny animals. The parish hauls water from the same distant taps, in larger containers on the back of a pick-up truck, to fill the tanks at church, rectory, and school. It is a stop-gap solution - after several years of inadequate rains -- and surveys must be done to drill wells somewhere, for parish and people throughout the area. It is hard to imagine the suffering of people who cannot get enough water! But it became evident very quickly in Kitete! And stories of water shortages throughout the world have now become much more real to me.

Kitete has no electricity, but solar power is commonly used. The roof panels on the rectory and church and school provide for basic energy needs, but there is also hope for power to reach there eventually. The relatively high elevation makes for some strong howling winds, as well as beautiful vistas, overlooking

freshly plowed fields awaiting the planting of corn, millet, and wheat. Forests ring the farms, and baked-mud homes show off colorful roofs and doors.

Sunday Mass brought crowds from afar to the main church. I marveled at how quickly they gathered, walking long distances from hidden houses all over the distant hills. A choir assembled early, led by a man playing a keyboard carried by two others, followed by drums and swaying, singing youth - the Holy Childhood group. They led Fr. Comfort Agele and myself into the church, and people followed, filling the coarse moveable pews with devotion and enthusiasm. Two hours later, we ended with an impromptu concert outside the church, hardly exhausting the choir's repertoire, I'm sure!

After a quick piece of bread and some coffee, Aristides, Mugo and I made a short stop at St. Joseph's chapel in Tsaama (not their turn for Mass today) and headed on to the outstation at Naray -- one of those primitive mud-on-a-stick structures! - for another long Mass with an even more enthusiastic choir of young people, who sang and swayed and after Mass (and a simple chicken and rice lunch) continued to welcome and entertain us up on their holy windswept mountain.

Holy Cross came to this region just over five years ago, realizing that they were attracting vocations from Tanzania and it would be good to have some ministry here as well. The bishop of Mbulu diocese offered this parish and it has been a challenge to us ever since. Our men stationed there have served the outstations, built a vocational/technical school at the main parish, and tried to keep alive a distant and much-needed dispensary. The three serving here now (Aristides from Tanzania, Comfort from Uganda, and Mugo from Kenya) struggle and work hard, but their commitment and hopes are most impressive. A parish back in Connecticut and a generous family foundation in South Bend have helped immensely at this first Holy Cross venture in Tanzania.

The main language here, as in Kenya, is Swahili, which has to be learned by the Ugandans (who come from several different language backgrounds). So the location of the major seminary in Nairobi has proved to be quite important. In turn, the Kenyans and Tanzanians must learn Rutoro, Luganda, and Lusoga to minister in Uganda, so their college and novitiate years in Uganda are also necessary. And overall, for non-native speakers their English facility rivals that of our fluent Indian priests! Certainly humbling, for us Americans! And an important lesson for a truly international community in the church.

But I digress. The people in this area of northwestern Tanzania are simple farmers, taller, lighter-skinned, and more shy than Ugandans. They live in very basic conditions, by and large get little education beyond primary school, and demonstrate tremendous patience and endurance. But they seem most anxious to welcome visitors, and to participate in Holy Cross ministry in Kitete. Protestant and Pentecostal churches are also scattered through the area, and some rudimentary ecumenical efforts are underway.

Monday morning Aristides decided to take me on a safari. I had said I was more interested in people than animals, but as the day went on, I was glad I agreed to the journey. After stopping at a small drug shop in Karatu, we entered the famous Serengeti National Park and began our descent into the amazing Ngorongoro crater. The vista from above is something to behold - a massive plain far below, a body of water and miniature roads, all surrounded by a high cliff circling for miles.

Getting down into the "crater" is a major experience in itself! A young Maasai boy named Moses chatted with me in quite good English as Aristides made the arrangements at the entrance to the crater. Moses wanted me to take his picture, buy some of his jewelry, and share some of my wealth. I pleaded poverty, but did enjoy talking with him. For 15 he was quite tall, even stately, draped in a bright red robe and carrying a staff and a large machete-like knife "for cutting the acacia trees." He said that at 16 he would be expected to marry and continue the line of Maasai herders who occupy the Ngorongoro region, on the rim of the crater and down inside. We parted with a handshake and exchange of smiles, if not of shillings. I am sure his picture is taken many times a day, as an endless procession of cruisers and Land Rovers begins the descent into Ngorongoro at his gate. Luckily the massive floor of the crater is ample enough to avoid traffic jams, except at a few locations of special animal "sightings."

Once we reached bottom, we began roaming the many dirt roads and paths, circling for hours, observing every imaginable animal (except the elusive handful of rhinos who supposedly dwell on the floor of Ngorongoro). Baboons welcomed us at the forest fringes, and as we entered the more barren central plains, we saw immense herds of zebras, black and white stripes (adults) and brown and white (younger ones), grazing and cavorting in the warm sun. Huge numbers of ugly wildebeests wandered aimlessly in these empty surroundings, munching on grass and searching for water. Early we observed a pair of cheetahs basking in the sun who decided to go on the chase, scattering the zebras and wildebeests, antelopes, warthogs, and prairie dogs far and wide. They seemed to enjoy the chaos they caused, and certainly maintained their reputation for speed! I could not see if they caught their lunch.

Aristides and I stopped for our lunch at a "picnic" ground on a small little lake. Many other vehicles also found their way to that spot and we watched a trio of hippopotamuses bathing and playing in the pond. Everywhere we saw an amazing variety of birds. Here at the pond small eagles circled and dove - one of them snatching Aristides' peanut butter and jelly sandwich right out of his hand and mouth! Proud ostriches wandered in their palatial surroundings, heads swaying in the breezes. Herons, cranes, ducks, and tiny yellow warblers, a menagerie of feathered creatures, all enjoying their crater home.

In the heat of the afternoon we continued to drive in what seemed to be aimless circles, occasionally seeing several vehicles locked in attention at some special sight. Thousands of massive horned buffalos, wandered and grazed, very different from those on the Great Plains of the old American West. And a pair of lions, male and female, resting in the sun, oblivious to the growing "herd" of cruisers filming their antics and lovemaking. Who is actually watching who down here in Ngorongoro!? Obviously the king (and queen) of the jungle did not care! As we drove into more shady forest areas, the practiced eye of Aristides caught sight of elephants moving slowly and almost

silently in the trees and brush. The African elephant is darker in color and has much larger ears and tusks than the Indian ones. And I suspect they are more wild and free-ranging.

We decided to "beat" the rush out of the crater; I am sure the hundred of tourists filming this "eighth wonder of the world" and of God's creation, eventually all followed us back up the only exit road to the top. But we didn't wait to see! Somehow we made it up the twisting rocky path and left the park. I am sure many of the safaris spent the night at various lodges and parks around the rim and continued on their journey through the massive Serengeti National Park the next day. I had seen enough animals for a good while! But it was truly a magnificent sight to behold.

The next day (January 24) I continued to tour the parish outstations of Wheat Scheme, Kambiya Simba, Ayongenda, and Twolodo Dirang with Fr. Comfort. Lots of song and dance, Coca Cola and cookies, chicken and rice, and smiling children. The people are proud of their parish and all are hoping someday to build small permanent churches at these outstations.

Mugo showed me all the facilities of the Audrey Veldman Vocational-Technical School at the parish, offering training in computers, sewing, weaving, carpentry, and mechanics. These students too welcomed me with song and dance. I urged them to learn all they could and go out to the area to bring in more students to share in the experience. The isolation, distance (though there is a girls' hostel), and expense are a considerable hindrance to greater numbers of students, as seems to be the case in most of our educational institutions in East Africa.

On Wednesday Comfort took me to the furthest reaches of the parish - the dispensary at Lositete and the outstation at Magena. Gracie, a Maasai women trained as a laboratory technician showed off the simple but adequate facilities of the dispensary. Water problems, attracting a competent and stable staff, and isolation are problems, but the Maasai people in the area are happy to have Lositete and what it provides. I signed the usual guest book and was amazed to see that many familiar visitors had made this lengthy journey before me! Finally Comfort and I were entertained, fed and watered at Magena (down that hill and back up another), a most enjoyable last stop on my visit to Kitete. Children sang and the elders of the simple church offered their welcome speeches. The vistas over fertile fields and Kitete valleys were gorgeous to behold in the afternoon sun.

The next day Aristides drove Mugo and me back to Arusha to catch the Impala shuttle for Nairobi. He had to do some shopping, get some new shock absorbers for one of the vehicles (no wonder!) and a new set of batteries for the solar system. Mugo had to have some more dental work done in Nairobi, so it was good to have his companionship on the journey. David Eliaona one of the seminarians soon to be ordained deacon picked us up at the Silver Spring Hotel (closer to McCauley House) and we rested after another long days journey.

On Friday I celebrated Mass for the house and then went with Brother Cleophas to visit Tangaza College where everyone studies. It is a consortium of many religious communities for theological studies, affiliated with the Catholic University of Eastern Africa. Holy Cross was one of the founding communities and has over the years provided some faculty and staff. A number of research and special institutes in African studies are also part of the complex of attractive buildings. Many hundreds of students, including women religious and a growing number of lay students are in attendance. Our Holy Cross men seem pleased and proud to be part of this thriving institution. Like our seminarians back home, they are being challenged in good ways, to accept the increasing role of women in the church and the true gospel demands of priesthood.

With Cleo I made some purchases at the Catholic Bookshop by the cathedral in downtown Nairobi, visited a rather elaborate shopping center, and stopped at the quiet and well-maintained cemetery of St. Austin's church where three of our Holy Cross men rest in peace: George MacInnes, Cesto Mushi, and James Karaffa.

Saturday I rested and began shifting things around in my bags for the return journey. Though I tried not to accumulate much, it always happens when you are traveling. People want to send things! And I am a grateful traveler so I always oblige! Later that day I met again with the Catholic Women Fighting AIDS in Kenya (CAWOFAK), who had just finished a day of therapy and recollection. We shared cookies and cokes and I gave them another pep talk. Their enthusiasm is contagious and at Margaret's behest my bag is filled with their small business products, sandals and jewelry to assist them! That evening I spent a few hours sharing my impressions and hopes with the McCauley House community. They are a delightful group and bring great energy and hope to Holy Cross.

Sunday I returned to Holy Cross parish at Dandora where I had spent Christmas week. Three Masses at the main church and three more at the sub-parish were all full, far surpassing the Christmas crowds. So many had gone to their villages for the holidays, and now all are back and in full voice and spirit! I thanked them for their welcome and told them I would carry many happy memories back home with me.

I'll have to admit I'm tired and ready to go home. I've been writing this on Monday and hope to send it out before departing Tuesday evening. Computers here are SLOW and I may not succeed, but if not, I'll do it from South Bend soon. Tonight I am taking the whole house to "Carnivore" a rather trendy, even touristy, restaurant nearby, fancy enough to use my credit card! And the men have been talking about it for weeks, since I promised them back in Kampala. East Africans are clearly carnivores! They love meat of every sort: always well-done, barbecued or roasted, and surrounded by "chips" (French fries) and a lot of carbs! And the local beers go very well with it. So much for my diet (and budget) tonight! But it will be a fitting end to my journey to our District of East Africa and an enjoyable last supper before the long flight(s) home.

Sorry I've rambled on so long, but thanks for reading this far! Many blessings!

যাদেরকে পেলাম

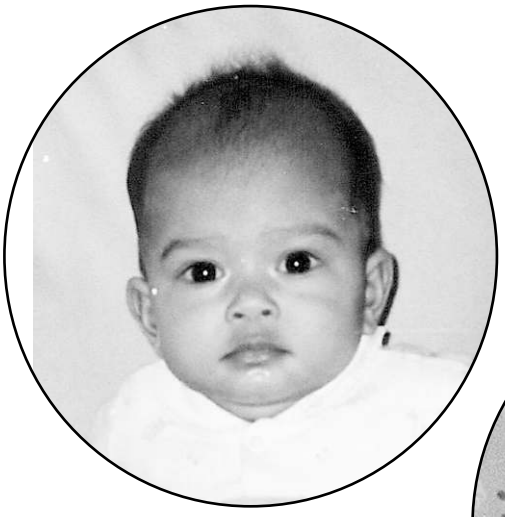

Trishna Angela Anna Gomes
April, 2006, Iselin, NJ
Parents: Gerald & Janet Gomes

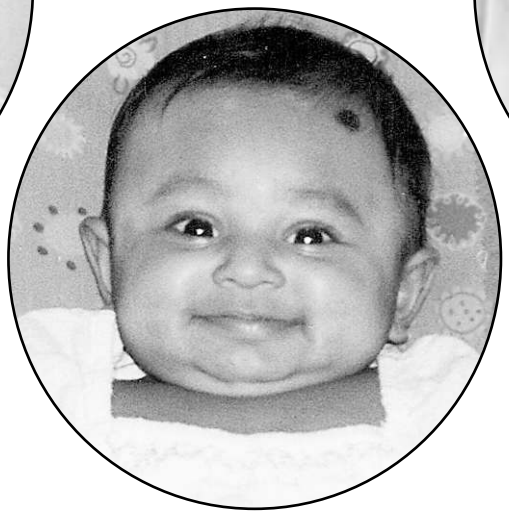

Rizpah Mozumdar
June, 2006, Jersey City, NJ
Parents: Uttam & Papri Mozumdar

Siddart D' Costa
2006, Adelphi, MD
Parents: Shankar & Trishna D' Costa

Richard Romeo Mendez
October, 2006, Jersey City, NJ
Parents: Robin & Renu Mendez

Rosemerry Helen Desa
May, 2006, Releigh, NC
Parents: Badal & Anjali Desa

Reya Rozario
2006, E. Elmhurst, NY
Parents: Gilbert & Roslyn Rozario

FIRST COMMUNION - 2006

Name: Urmila P. Gomes
Parents: Theotonius & Shelly Gomes
Carmel, New York

WEDDING

Danny and Mousumi
September 2, 2006
New Jersey

Joseph & Meriline
2006
Connecticut

Jacob & Kiran Gomes
2006
Jersey City, New Jersey

৫০তম বিবাহ বার্ষিকী

টিমোথী
ও
সরলা গমেজ

বিবাহ বন্ধনঃ
আগষ্ট ১৪, ১৯৫৬

৫০ তম জুবিলি অনুষ্ঠানঃ
হার্টফোর্ড, কানেকটিকাট

সিলভেষ্টার
ও
শোভনা লিলি রিবেরু

বিবাহ বন্ধনঃ
জানুয়ারী ২৩, ১৯৫৬

৫০ তম জুবিলি অনুষ্ঠানঃ
হার্টফোর্ড, কানেকটিকাট

যাদেরকে হারালাম

স্বর্গীয়া আগ্নেশ গমেজ

জন্মঃ জানুয়ারী ৯, ১৯২৭

মৃত্যুঃ জানুয়ারী ১১, ২০০৬

কানেকটিকাট

স্বর্গীয়া ক্যাথরিন গমেজ

জন্মঃ এপ্রিল ১২, ১৯২৬

মৃত্যুঃ জুন ১২, ২০০৬

ঢাকা, বাংলাদেশ

ঈশ্বর তাদের আত্মার মঙ্গল করুন।

কবিতাগুচ্ছ

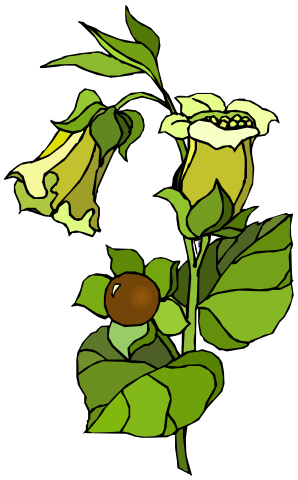

আবেদনপত্র

সুবর্ণা জাসিন্তা গমেজ

সবিনয়ে জানাচ্ছি আমার আকুল প্রাথনা
না, আজ আর নিজের জন্য কিছুই চাইব না।
বলবো না অনুর্বর আমাকে আবার উর্বর করে দাও
গর্ব করে শোনাব না ফেলে আসা ইতিহাস।

শুধু দুঃখ করে বলতে ইচ্ছে করছে
ঐ যে লাল সবুজের পতাকা উড়িয়ে-
ঘটা করে ভাষা দিবস পালন করছো
রাখতে কি পেরেছো ঐ দুর্লভ ভাষার সন্মানকে?
বিজাতীর মতো সম্পর্ক গড়েছো দেশের সঙ্গে
বারুদের ধ্বংস স্তুপে দুষিত করছো আমার ধুলিকনাকে
আর লাশের কথা! নাইবা বললাম তোমাদের -
যে শিশু ষড়যন্ত্রের বেষ্টনীতে বড় হচ্ছে দুর্বার সাহসিকতায়
মায়ের আঁচলের ফাঁক দিয়ে ভয়ার্ত চোখে দেখছে বিশ্বকে,
আজ রাজপথে তোমরা কোন নিশ্চয়তা দেবে তাকে?
কোন অনুকুল ভবিষ্যতের আশ্বাস থাকবে তার জন্য?
যে দেশের মানুষ নিজের অধিকার চাইতে পারে না
কণ্ঠনালীর জড়তা ঘুচিয়ে মায়ের ভাষায়,
ব্যক্ত করতে পারে না হৃদয়ের গ-ানির কথা
সেই দেশে ভাষা দিবস এখন ভিন্ন আমেজে অন্যকিছু।

একঝুড়ি ফুলের জন্য যে ভাষা দিবস,
সেতো অপরাহ্নের হারিয়ে যাওয়া সূর্যের মতো।
প্রভাতে উদিত হয়ে গগনজুড়ে আবীর মেখে দিয়ে
দিনশেষে গোধূলীর নীলাভ ভূমিতে সমাধি রচনা করা।
আত চেয়ে বরং আমরা এখানেই নেমে যাই।
নয়তো আবারও রক্তস্নানে শুচি হই সমস্ত জাতি।
পিচঢালা পথে আবারও অঙ্কন করি বর্নমালাকে,
অধিকারের প্রশ্নে প্রতিষ্ঠিত করি বেঁচে থাকার স্বাধীনতা।
অতীতকে ঘিরে যে বাস্তবতার লড়াই
সেই স্বর্ণযুগের অতীত উপলব্ধি করি আপনহৃদে।
উত্তপ্ত মিছিলের মুখে ছড়িয়ে পড়ি অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মতো
এযেন ফাল্গুনের পলাতক রোদে শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে,
বাতাসে ঝড়ে যাওয়া লাল শিমুলের ছড়াছড়ি
সরে গিয়ে অন্য শিমুলকে অঙ্কুরিত হবার আহ্বান।
{ভাষাদিবস ও ভাষা শহীদদের প্রতি
বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে এই কাল্পনিক
কবিতাটি উৎসর্গ করা হলো।}

স্বপ্ন

শিউলী গমেজ পাচু
রেলে, নর্থ ক্যারোলিনা

নীল কাগজের মোড়ানো ছোট একটি বাক্স
তার ভিতরে কি? সেটা যদি জানতে চাও,
তবে তোমাকে অনেকক্ষন অপেক্ষা করতে হবে।
যে সময়ে কেহ কাছে থাকবে না,
কেহ তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না।
তুমি চলে যাবে দুরে বহু দুরে,
তোমার নয়ন জুরে জ্বলবে নীল আলো।
পাখীর গান - ফুলের গন্ধ পাবে তুমি,
দুরে বহুদুরে লেকে ভেসে আসবে ঝরনার শব্দ।
তুমি ভাববে আমি কোথায় আছি,
তোমার চারপাশে আলো, কোন মানুষ নেই,
তুমি হাটবে, শুধু হাটবে, হয়তো সামনে পরবে নদী
ছলছল করে বয়ে গেছে দুরে বহুদুরে।
তুমি নদীর পাড় ধরে হেটে যাবে,
তুমি জানবে না কোথায় যাচ্ছ তুমি শুধু যাচ্ছ।
হঠাৎ পূর্ব দিক লাল করে সূর্য উঠবে
তুমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে
তুমি ভাববে আমি কোথায়, চেনা চেনা লাগছে,
ঐতো আমার গাঁ, ঐখানে আমার বাড়ী।
তবে কি আমি চলে এসছি ইছামতির তীরে ছোট এই গ্রামে
আমার স্বপ্ন আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে।
আমি বিভোর হয়ে শুনছি পাশের গীর্জার ঘন্টা ধ্বনি
আমার গ্রাম, আমার জন্মভূমি এইতো আমার সাথে
যাব নারীর যোগ, তাই তার টানে আমি ফিরে এসেছি
আমি চিৎকার করে বলবো
আমি এসেছি আবার আসবো ফিরে তোমার কাছে
ঘুম ভেঙ্গে যাবে তোমার, নীল বাক্সটা বন্ধ হয়ে যাবে
তুমি ফিরে আসবে বাস্তবে, ঘরটা মনে হবে বন্দী কারাগার
তুমি ভাববে স্বপ্নের মাঝে যদি বেঁচে থাক যেত,
তবে তুমি হতে সবচেয়ে সুখী মানুষ।